অনীক

আগস্ট ২০১২

বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ২

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ

অথ শিলাদিত্য কথা ❑ ২

আবার মারুতি-মানেসর ❑ গৌতম সেনগুপ্ত ❑ ৩

চিদাম্বরমের কাহিনী ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ৫

বিজাপুর নরমেধ ❑ শ্যামল দাশ ❑ ৭

দারিদ্রে ডুবছে দেশ ❑ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ❑ ৮

স্মরণ

ঝাঁসি-বাহিনীর লক্ষ্মী ❑ ৯

প্রবন্ধ

জঙ্গলমহলে মাওবাদী রাজনীতি ❑ বিশ্বজিৎ রায় ❑ ১০

বিশ্বজোড়া স্থবিরতা ও চীন ❑
জন বেলামি ফস্টার ... ❑ ২২

মতামত

প্রসঙ্গ: 'ভারতে 'মাওবাদ' ❑ হর্ষ ঠাকোর ❑ ৩৪

কবিতা/গান

কবীর সুমনের গান ❑ ২

প্রশ্ন তোলা ❑ সব্যসাচী গোস্বামী ❑ ২১

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও
টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নেপথ্যে

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ায় অনেকেই খুশি। কেউ খুশি হয়েছেন 'চাণক্য' নামে অভিহিত প্রবীণ এই রাজনৈতিক নেতা দেশের সর্বোচ্চ পদ পাওয়ায়, কেউ বা আবার এই সুযোগে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর এক নম্বর দল কংগ্রেসের সাথে দুই নম্বর তৃণমূলের মধ্যে গণ্ডগোল বাধলে পরে ভোটে সুবিধে হবে— এই প্রত্যাশায়। আমরা খুশি হই নি, এবং সেটা একারণেই যে, আগে থেকেই আমাদের মনে হচ্ছিল, এর পিছনে কট্টর সংস্কারবাদীদের—অর্থাৎ বিশ্বব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ ভারতীয় প্রতিভূদের বিশেষ ভূমিকা আছে। আমাদের সেই আশঙ্কা এখন সত্যি বলে ধরা পড়ছে। তার মানে কি এই যে প্রণববাবু 'সংস্কারবাদী' নন? না, এমনটা মনে করার কোনো যুক্তিই নেই। কিন্তু ভারতে বিশ্বায়নের বিগত দুই দশকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ধরা পড়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান নয়া উদারবাদী মডেলটি ১৯৪৭-পরবর্তীকালে অনুসৃত পাবলিক-সেক্টর-ভিত্তিক নেহরুবাদী লাইন থেকে অনেকটাই আলাদা। যে কংগ্রেস দলটি এখন এদেশে বিশ্বায়ন-কর্মসূচীর সবচেয়ে বড়ো ধারক-বাহক, তারাই ওই অনুসরণ করতো। কিন্তু বিশ্ব-পুঁজিবাদের ঘনায়মান সংকটের প্রেক্ষিতে রাজীব গান্ধীর জমানায় ওই পথ থেকে সরে আসার প্রবণতা শুরু হয়, এবং অবশেষে ১৯৯১-এ নরসিংহরাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে বিশ্বব্যাংক থেকে সদ্য-অবসর-নেওয়া অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে সেই পথ ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। মনমোহনকে 'যোগ্য' সহযোগিতা করতে থাকেন চিদাম্বরম ও মন্টেকসিং আলুওয়ালিয়ার মতো বিশ্বব্যাংকের চাপিয়ে-দেওয়া সর্বনেশে পথের বশংবদ পথিকরা। পরবর্তীকালে যারা ক্ষমতায় বসেছে, তারা সবাই-ই ওই পথ অনুসরণ করে চলেছে।

২০০৪-এ ক্ষমতায় ফিরে এসে কংগ্রেস দলটি সেই সংস্কারের পথই অনুসরণ করতে থাকে, কিন্তু দীর্ঘ আট বছর ক্ষমতায় না থাকাটা তাদের একটা শিক্ষাও দিয়ে যায়। সেটা এই যে, প্রকৃত অর্থে বিশ্বব্যাংক প্রণোদিত কট্টরপন্থা অনুসরণ করলে ব্যাপক জনগণের দুর্দশা যেভাবে বাড়বে, তাতে নিঃসন্দেহে তাদের সমর্থন কমবে। তাই কংগ্রেস নেতৃত্বও সংস্কারের পথে দেশকে পরিচালনা করার পক্ষে থাকা সত্ত্বেও একটু ধীর পদক্ষেপে চলার পক্ষপাতী। সোনিয়া গান্ধী এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, এবং তাঁর পক্ষে ছিলেন প্রণববাবু থেকে শুরু করে দিগ্বিজয় সিং, জয়রাম, মণিশংকর আয়ার প্রভৃতিরা। বিশ্বব্যাংক ২০০৯-এ অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রণববাবুর বদলে আলুওয়ালিয়াকে এবং তৈল দপ্তর থেকে মণিশংকরের অপসারণ চেয়েছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে রাজি হলেও কট্টর কাউকে প্রণববাবুর বদলে বসাতে রাজি হয় নি। সেকারণেই দিন দিন কট্টরপন্থীরা সংস্কারের শ্লথগতির বিরুদ্ধে সমালোচনার তীব্রতা বাড়াতে থাকে— প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা থেকে শুরু করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের পরিচালকরা, দেশ-বিদেশের কর্পোরেট পুঁজি, এমনকি স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা পর্যন্ত।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তাদের সুযোগ করে দেয় প্রণববাবুর পদোন্নতি ঘটিয়ে পথের কাঁটা দূর করতে। এ প্রসঙ্গেই বিশেষ লক্ষণীয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে সোনিয়া গান্ধীর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। আর মনমোহনরা তো ঠিক এটাই চাইছিলেন—প্রণববাবুকে 'প্রমোশন' দিয়ে বিশস্ত কাউকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে। বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটেছে। চিদাম্বরম অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়েই নয়া উদারবাদী পথে দ্রুততর যাত্রার জন্য পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন, কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে ব্যাংকগুলিকে সুদের হার বাড়াতে চাপ দিচ্ছেন— কারণ দেশকে সাম্রাজ্যবাদের পদতলে উৎসর্গ করতে হলে বেশি সময় হাতে নেই, ২০১৪-তেই পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন, তার বেশ কিছুটা আগেই যা করার করে নিতে হবে।

অথ শিলাদিত্য কথা

একজন মহান বিপ্লবী বলেছিলেন, এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষমতার প্রতি এতোই মোহান্ধ হয় যে, একবার ক্ষমতা পেলেই তারা সেটাকে আঁকড়ে ধরে, যেন-তেন-প্রকারেণ তা ধরে রাখতে চায়, এবং পাছে ক্ষমতা চলে যায় —এই আশঙ্কায় একটা পাতা পড়ার শব্দেও আঁৎকে ওঠে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ১৫ মাসের মুখ্যমন্ত্রী মমতা দেবীর আচার-আচরণের সাথে লক্ষণগুলি এক্কেবারে মিলে যাচ্ছে। প্রথমে একটি মজার কার্টুন দেখে তিনি এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন যে, সেই কার্টুনটা পাঠাবার অপরাধে দুই ভদ্রলোককে (একজনের বয়স আবার সত্তরেরও বেশি) বেআইনিভাবে জেলে পুরে দিলেন। খেয়াল করলেন না যে, ব্যাপারটা নিয়ে জল ঘোলা করার পেছনে আসলে ছিল তাঁদের আবাসনের জমি দখল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দলেরই প্রমোটারদের চক্রান্ত।এ নিয়ে মানবাধিকার কমিশন ন্যায়সঙ্গত রায় দিতেই মুখ্যমন্ত্রী আরো খেপে গেলেন, এই ধরণের কমিশন-টমিশন বসাবার বিরুদ্ধেই তোপ দেগে বসলেন—ভুলে গেলেন যে, তিনি নিজেই নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট জমানার স্বৈরতান্ত্রিক কার্য-কলাপ উদ্ঘাটিত করার জন্য এরকম বেশ কয়েক গণ্ডা কমিশন বসাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, এবং গণ্ডা দু'য়েক ইতিমধ্যেই বসিয়ে দিয়েছেন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, মানবাধিকার কমিশন বসাবার বা না বসাবার সিদ্ধান্ত নেবার সামান্যতম এক্তিয়ার তাঁর নেই, কারণ এটা একটা সাংবিধানিক বিধি, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত।

এর সাথেই তুলনীয় শিলাদিত্য-কাণ্ড। বেচারি আগে বাসের কর্মী ছিলেন, কাজ খুইয়ে গ্রামে গিয়ে চাষবাস করে সংসার চালাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষত বহুজাতিক শস্যবীজ কোম্পানিগুলির, এবং পরোক্ষে সরকার ও সরকারি মদতপ্রাপ্ত এজেন্ট বা দালালদের কারসাজিতে সারের দাম এতোই বেড়ে গেছে যে, চাষবাস থেকে সামান্য উদ্বৃত্তও রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য তাঁর যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভ, সতত জনহিতৈষণার কথা প্রচারে সোচ্চার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় সেই ক্ষোভের কথাই. তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। হয়তো তাতে পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটিও থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্যই 'মাওবাদী' বলে চিহ্নিত করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জেলে ঢোকাবার ব্যবস্থা করবেন! এটা কি সত্যিই পাতা পড়ার শব্দেই আঁৎকে ওঠার সাথে তুলনীয় নয়?

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য খুবই ব্যস্ত মানুষ, তাই ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি বেমালুম ভুলে যেতেই পারেন। নাহলে তাঁর হয়তো মনে পড়তো, ভোটের আগে তিনি কোনো 'মাওবাদী' অন্তত পশ্চিমবঙ্গে খুঁজে পেতেন না, বলতেন— 'মাওবাদী'রা আসলে সিপিআই(এম)-এরই লোক। কিন্তু ভোটের পরেই তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন যে, এই রাজ্যে গিজ্‌গিজ্‌ করছে তারা— জলেস্থলেপথেঘাটে সর্বত্র। তাই, পুলিশ প্রথমে শিলাদিত্যের বিরুদ্ধে তেমন কিছু না পেয়ে ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আবার তদন্তের জন্য গ্রেপ্তার করে, কিন্তু তেমন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আপাতত ১৫ দিনের জন্য জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাঁরা সম্ভবত বাইবেলের সেই মহান বাণী স্মরণ করে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন : ঈশ্বর বল্লেন— আলো হোক, এবং আলো হয়েছিল!

আমাদের মাঝে মাঝে অবাক লাগে একথা ভাবতে যে, এটাই সেই পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে মাত্র কয়েক বছর আগে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর বিপুল মানুষ, বিশেষত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিয়েছিলেন সিপিআই(এম)-এর স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে। তাঁরা আজ কোথায় শিলাদিত্যের মতো ঘটনার প্রেক্ষিতে? বেশ কিছুজন অবশ্য বৈতনিক বা অবৈতনিক বিভিন্ন পদ পেয়েছেন মমতা জমানায়। এটুকুতেই তাঁদের বিবেক বিক্রি হয়ে গেল? আর বাকিরা? তাঁরা আবার গ্রীষ্ম কাটিয়ে শীত-ঘুমে চলে গেলেন! ভবিষ্যতের কাছে কী উত্তর দেবেন তাঁরা— নিজেদের কট্টর গণতান্ত্রিক বা বামপন্থী বা মানবাধিকারপন্থী বলে অভিহিত করার দাবিদাররা, ভেবে দেখেছেন? তবু এপিডিআর ঘটনার পরের দিনই 'মাওবাদী' হিসেবে চিহ্নিত হবার ঝুঁকি নিয়েও বিবৃতি দিয়ে ঘটনাটির নিন্দা করেছেন এবং একে 'মুখ্যমন্ত্রীর উস্কানিজাত রাজনৈতিক অধৈর্যের ঘটনা', এবং 'মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক সংবিধানের ১৯নং ধারায় প্রদত্ত দ্বিমত পোষণ করার ও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাবার অধিকারের বিরোধিতা' বলে অভিহিত করেছে। অন্তত মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবী প্রকাশ্যেই এই ঘটনার জন্য সরকারের বিরোধিতা করেছেন। আর কবীর সুমন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরে প্যারডি গান বেঁধেছেন। কার্টুন এঁকেছেন, বা কবিতাও লিখেছেন কেউ কেউ।

অনীক-ও তাঁদের সবার সাথে নিজের ক্ষুদ্র কণ্ঠ যুক্ত করছে।

২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

Unfiled Notes Page 2

ঘটনাপ্রবাহ

আবার মারুতি -মানেসর

১৮১১ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত ইংলন্ডে গড়ে ওঠা লুডাইট আন্দোলন সম্পর্কে ইতিহাসবিদ এরিক হব্‌সবম্‌ :
"Collective bargaining by riot"

গত ১৮ জুলাই ২০১২ মারুতির মানেসর কারখানার একটি ঘটনা সংবাদপত্রের শিরোনামে চলে আসে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জনৈক সুপারভাইজার জনৈক শ্রমিককে জাত তুলে গালি দেয়। ক্ষিপ্ত হয়ে সেই শ্রমিক সুপারভাইজারকে চড় কষায়। ফলে শ্রমিকটিকে সাসপেন্ড করে কর্তৃপক্ষ। শিফটে উপস্থিত শ্রমিকরা অবিলম্বে সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি জানাতে থাকে। কর্তৃপক্ষ রাজী হয় না, মার্চ ২০১২ স্বীকৃত নতুন ইউনিয়নের সাথে মিটিং চললেও কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন বহাল রাখে। ফলে শিফটের শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারখানার ভিতরে দাঙ্গা-অগ্নিসংযোগ মারধোর চলতে থাকে। ম্যানেজমেন্ট-সুপারভাইজার সহ সাধারণ শ্রমিকরাও আহত হন। মানবসম্পদ বিভাগের জনৈক ম্যানেজারের পোড়া দেহ পরের দিন পাওয়া যায়। ভয়ঙ্কর ভাবে পুড়ে যাওয়া দেহ সনাক্ত করার মত অবস্থায় না থাকলেও তাঁর পরিবার সোনার দাঁত দেখে অবনীশ কুমার দেবকে সনাক্ত করেন।

ঘটনার পরে (২০ জুলাই) মারুতি কর্তৃপক্ষ মানেসর কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য লক-আউট ঘোষণা করেন। লক-আউটের নোটিশটি সাঁটানো ছিল সদ্য স্বীকৃত 'মারুতি-সুজুকি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন আইএমটি, মানেসর, গুরগাঁও (রেজি নং ১৯২৩), ১ মার্চ ২০১২'-র ফলকের উপর।

আমরা জানি, গত বছর মারুতির মানেসর কারখানায় অভূতপূর্ব শ্রমিক আন্দোলন চলেছিল কয়েক মাস ধরে। আর সেই আন্দোলনে ঠিকা শ্রমিকদের সমর্থনে ধর্মঘটে নেমেছিলো স্থায়ী শ্রমিকরা। মানেসর গুরগাঁও-ধারুহেড়া অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল এক অদম্য শ্রমিক ঐক্য। কোন অর্থনৈতিক দাবি নয়, নিজস্ব ইউনিয়নের স্বীকৃতি ও ঠিকা শ্রমিকদের জন্য জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি— এই দাবিতে ধর্মঘটে নামেন শ্রমিকরা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমগ্র অঞ্চলে কর্মরত ১০-১২ লাখ শ্রমিকের মধ্যে ৭০-৮০ শতাংশ শ্রমিকই অস্থায়ী বা ঠিকা শ্রমিক। এ ধরনের একটি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সাথে লড়ার পর শ্রমিকদের একটা অংশ কেন এমন হিংসাত্মক হয়ে উঠলেন?

হরিয়ানা সরকার বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে এবং কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অনুসন্ধানের সাথে সরকারের তথ্য মিলিয়ে নিচ্ছে। জাপান দূতাবাস তার নিজস্ব অনুসন্ধান শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ আর সরকার সমগ্র ঘটনা দায় চাপাতে চাইছে শ্রমিকদের ওপর।

প্রশ্ন উঠছে ১৮ জুলাইয়ের দাঙ্গার সময় কোম্পানি নিযুক্ত ৩০০ জনের বাউন্সার বাহিনী (প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড) কী করছিল? কয়েকটা টিয়ার-গ্যাসের সেল ফাটালে বা যথাসময়ে পুলিশি হস্তক্ষেপ ঘটলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যেত। কারখানার মেন গেট কারা বন্ধ করল? এসব প্রশ্নের কোনটারই উত্তর নেই। ২০০৫ সালে কিন্তু হরিয়ানা পুলিশই হোন্ডা শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে লাঠি চালিয়েছিল।

গুরগাঁও-মানেসর-ধারুহেড়া অঞ্চলে কারখানায় মৃত্যু নতুন নয়। এবারের ঘটনার নতুনত্ব এটাই যে মৃত ব্যক্তি একজন ম্যানেজার। স্মরণ করা যেতে পারে, ২০০৯ সালের ১ মে-র দুর্ঘটনাটি। লাখানি গ্রুপের ফরিদাবাদের কারখানাটিতে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় কমপক্ষে ১৫ জন শ্রমিকের। সংখ্যাটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী। স্থানীয় শ্রমিকদের মতে মৃত শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশি। লাখানি গ্রুপ ভালকাইজ্‌ জুতোর বৃহত্তম রপ্তানিকারী। বয়লার বিস্ফোরণ থেকে দুর্ঘটনা ও ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। আগুনে পুড়ে বা জ্বলন্ত বদ্ধ ঘরে অক্সিজেনের ঘাটতি জনিত কারণে মৃত্যুর যন্ত্রণা একই রকম।

মৃত শ্রমিকদের মাত্র একজনের কাছে ইএসআই কার্ড ছিল। বাকি শ্রমিকরা লাখানির প্রত্যক্ষ শ্রমিক ছিল না। তারা ছিল ঠিকা শ্রমিক বা শ্রমিক সরবরাহকারী কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিক। পরে অবশ্য নিয়মমাফিক তদন্ত হয় এবং তদন্তে জানা যায় লাখানি গ্রুপের ফরিদাবাদে ঐ কারখানার কোন রেজিস্ট্রেশন ছিল না। জাতীয় নমুনা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ এই পাঁচ বছরে এদেশে ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ২ কোটি ১০ লাখ আর স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৫৮ লাখ। ২০০৯-এর অক্টোবরে রিকো কারখানার শ্রমিক অজিত যাদবের হত্যা সংগঠিত করে মালিকের গুন্ডারা পুলিশের সাহায্যে। পুলিশ প্রথমে এফআইআর নেয়নি। পরে প্রায় এক লাখ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হলে তদন্ত শুরু হয়। দুজন গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু শ্রমিকদের মতে প্রধান চক্রান্তকারীরা অধরাই থেকে যায়। বেকায়দায় পড়ে রিকো কর্তৃপক্ষ অজিত যাদবের মৃত্যুর জন্য শোকপ্রস্তাব নেয় ও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে। গুরগাঁও-মানেসর-ধারুহেড়া অঞ্চলে অনুসন্ধান চালালে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রত্যক্ষ হিংসার সন্ধান মিলবে অহরহ। সেই হিংসার সংগঠক অবশ্যই মালিকরা।

১৮ জুলাই ঘটনার পর মারুতি-সুজুকি কর্তৃপক্ষ প্রথমে ৫৫জন শ্রমিকের নামে এফআইআর করে। পরে আরও প্রায়

৬০০ জনের নাম এফআইআর-এ যুক্ত করা হয়। যুক্ত করা হয় সদ্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সভাপতি সম্পাদক সহ সব কর্মকর্তাদের নাম।

মারুতির মানেসর বন্ধ থাকার অর্থ শুধুমাত্র মারুতির স্থায়ী, অস্থায়ী, ঠিকা, শিক্ষানবিশ মিলিয়ে ৩০০০ শ্রমিকের কর্মচ্যুতি নয়। মারুতির সহযোগী শিল্পের শ্রমিকসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। যাদের প্রায় সবটাই ঠিকা বা কন্ট্রাকটর শ্রমিক। আর এরা এসেছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরাঞ্চল থেকে। মারুতি-সুজুকির মানেসর কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা মানে এই বিশাল শ্রমিক বাহিনীর, বয়স যাদের প্রায় সবারই ৩০-এর মধ্যে, তাদের কর্মচ্যুতি। এ মুহূর্তে বাস্তবতই মানেসর দাঁড়িয়ে আছে বারুদের স্তূপের ওপর। আর এখানেই ভয় হরিয়ানা সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার আর মালিকদের। তাই তারা একদিকে চূড়ান্ত দমন-পীড়ন নামিয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি-সম্পাদক সহ প্রায় ১০৫ জন শ্রমিক বন্দী হয়ে আছেন ভোঁড়শির জেলে। দেখানো হচ্ছে মাওবাদী সংস্রবের ভয়।

আর অন্যদিকে মারুতি-সুজুকির উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করছেন যে তারা অ্যাসেম্বলি লাইন, প্রেস শপ বা পেন্ট শপে আর ঠিকা শ্রমিক রাখবে না। এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত ঠিকা, শিক্ষানবিশরা স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কারখানায় নিযুক্ত হবেন। এ ধরনের ঘোষণার মধ্যে আছে গভীর চক্রান্ত। মারুতি-সুজুকির মানেসর কারখানায় চলা লাগাতার শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃপক্ষকে অনেক তিক্ত প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। গত বছরের শ্রমিক আন্দোলনের পর এটা আমাদের জানা হয়ে গেছে যে মারুতির ঠিকা শ্রমিকরা ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা মাত্র মাসিক মজুরি পায়। অন্য কোনও সুবিধা, এমনকি মেডিকেল ছুটিও তারা পায় না। আর কাজের পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। ৩০ মিনিটের টিফিন। তার মধ্যে কর্মস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়। চা পানের বিরতি ৭ মিনিটের। একে বলা হয় 'লীন উৎপাদন' পদ্ধতি। এই পরিস্থিতির কথা জানে প্রচারমাধ্যম, নাগরিক সমাজ। তাই অনেক চেষ্টা করেও ১৮ জুলাই-এর ঘটনার দায় শ্রমিকদের ওপর চাপানো যাচ্ছে না।

গুরগাঁও-মানেসর-ধারুহেড়া অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত কিছু কর্মী সমগ্র ঘটনাটির সারসংকলন করার চেষ্টা করেছেন এইভাবে:

১। মারুতি কর্তৃপক্ষ শ্রম দপ্তরের মদতে একটি বে-আইনি অর্ডার বানিয়ে রেখেছে। এর ফলে কারখানার ভেতরে ম্যানেজাররা শ্রমিকদের ধমকানো, গালিগালাজ করা, অপমানজনক আচরণ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

২। মারুতি 'লীন-উৎপাদন' ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকরা দম নেওয়ার ফুরসত পায় না। এই ব্যবস্থা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিপন্থী। ফলে উৎপাদনে যুক্ত শ্রমিকদের স্বাভাবিক আচরণে এই ব্যবস্থা প্রভাব ফেলে।

৩। ২০১১ সালের পাঁচ মাসের ধর্মঘট শ্রমিকদের দেখিয়েছে কর্তৃপক্ষ আইন বা আলাপ-আলোচনার ভাষা বোঝে না। তারা শুধু বোঝে ক্ষমতা। সরকার-প্রশাসন-কারখানা কর্তৃপক্ষের আঁতাত এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির শ্রমিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির অভিজ্ঞতা তাদের সমৃদ্ধ করেছে।

৪। মারুতি-সুজুকি কর্তৃপক্ষ কখনই শ্রমিকদের ইউনিয়ন বানানোর কাজ খোলা মনে মেনে নেয় নি। নতুন ইউনিয়ন স্বীকৃত হওয়ার পরেও শ্রমিকদের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব বজায় রেখেছে

৫। ইউনিয়ন স্বীকৃত হওয়ার আগে কর্তৃপক্ষ শ্রম দফতরের যোগসাজসে এক বে-আইনি সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। কারখানার ভিতর তারা দুটি কমিটি বানায়। আর সেই কমিটি নির্বাচনে কোন চার্জশীট-সাসপেন্ড হওয়া শ্রমিক অংশ নিতে পারবে না বলে শর্ত চাপায়। ১৯১১-র আন্দোলনের সময় ইউনিয়ন নেতাদের অধিকাংশই চার্জশীট প্রাপ্ত বা সাসপেন্ড ছিল।

৬। নভেম্বর ১৯১১-তে ইউনিয়নের মূল নেতৃত্বকে পয়সা ও ক্ষমতার জোরে ইস্তফা দেওয়ানোকে আদতে ইউনিয়ন ভাঙ্গার চক্রান্ত হিসাবে দেখা উচিত। এর ফলে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস যেমন বেড়েছে তেমনি কর্তৃপক্ষের প্রতি আস্থা কমেছে। বেড়েছে ক্ষোভ ও তিক্ততা। কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপগুলি শ্রমিকদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বাড়িয়েছে।

৭। গত জুন মাসে জনৈক সুপারভাইজারের সাথে খারাপ ব্যবহারের অজুহাতে সদ্য স্বীকৃত ইউনিয়নের সভাপতিকে সাসপেন্ড করা হয়। কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ শ্রমিকদের অপমানিত করেছে, তাদের ক্রোধ বাড়িয়েছে।

৮। নতুন ইউনিয়ন স্বীকৃতি পেয়েছে ২০১২ মার্চ। এ সত্ত্বেও জুলাই মাস পর্যন্ত কারখানা গেটের বাইরে ইউনিয়নকে কোন প্রকার সভা, জমায়েত ইত্যাদি করার অনুমতি দেয়নি কর্তৃপক্ষ।

৯। বিগত ২ মে ২০১২ থেকে দাবি সনদের আলোচনা চলছিল। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ১৬ জুলাই তাদের লিখিত প্রতিক্রিয়া দেয়। ইউনিয়ন তা শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করে। দাবিসনদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মত জেনে শ্রমিকদের ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। কর্তৃপক্ষ ঠিকা, ক্যাজুয়াল ও ট্রেনি-দের ব্যাপারে ইউনিয়নের সাথে কোন আলোচনা চায় না। শ্রমিকরা একে তাদের ঐক্য ভাঙার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত হিসাবে দেখে। কর্তৃপক্ষ ভেরিয়েবল ডিএ ও ২০০ টাকার বেশি শিক্ষা-ভাতা দেবে না বলে জানায়। কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সাথে আদতে কোন সম্মানজনক চুক্তি করতে চায় না— এটাই প্রতিভাত হয়।

১৮ জুলাই মানেসর মারুতি-সুজুকি কারখানার হিংসাত্মক ঘটনাকে বুঝতে হলে এই সমগ্র প্রেক্ষাপটটি মাথায় রাখতে হবে।

১৯৯০-র পর থেকে গুরগাঁও-মানেসর-মুন্ডেশ্বর-ধারুহেড়া অঞ্চলে নব্য উদারবাদের ও রাজ্য-কেন্দ্র সরকারি বদ্যান্যতায় বিনিয়োগের ঢল নামে। শুধুমাত্র এই অঞ্চলই নয় এনসিআর বা ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নের (দিল্লী, ফরিদাবাদ, গাজিয়াবাদ, হরিয়ানা, রাজস্থান, পঞ্জাব উত্তরাঞ্চল ও হিমাচলের নীচের দিক) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুঁজি বিনিয়োগ বেড়েছে ব্যাপক মাত্রায়। এই শিল্পাঞ্চলে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বয়স ৪০-এর মধ্যে। অনেকেই আইটিআই বা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত। বিনিয়োগ যেমন বেড়েছে তেমনই বেড়েছে শ্রমিক নিয়োগ। আর তারই ফলশ্রুতিতে শ্রমশক্তির মালিকদের স্বার্থে পুঁজির মালিকদের সংঘাত। কারণ ভারতীয় গণতন্ত্র শ্রমিক আন্দোলনের কারণে তার কাঠামোর মধ্যে যে শ্রম-আইন চালু করেছিলো নব্য উদারবাদ তাকে সমূলে উপড়ে ফেলেছে। শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ-ক্ষোভ-বিক্ষোভ এখন আর লেবার দপ্তরের মাধ্যমে মীমাংসা হয় না। একদিকে ঠিকা শ্রমিক, কন্ট্রাকটর-শ্রমিক আর অন্যদিকে মালিক-রাজনৈতিক দল-আমলা-প্রশাসন। এই ভুল-ভুলাইয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জায়গা বা সুযোগ।

গৌতম সেনগুপ্ত

চিদাম্বরমের কাহিনী

চিদাম্বরম আবার ভারতের অর্থমন্ত্রী হলেন। এই সুযোগে তাঁর সম্পর্কে দুই-চার কথা বলে নেওয়া দরকার।

ব্রিটিশ আমলের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির চেট্টিনাড়-এর রাজ-পরিবারে চিদাম্বরমের জন্ম। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ পাশ করেন ১৯৬৮ সালে। ভারতে পদার্পণ করে তিনি ওকালতি শুরু করেন। দেশে ফেরার পর ওকালতির ফাঁকে ফাঁকে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইংরাজি বক্তৃতা তামিল ভাষায় অনুবাদ করে দিতেন। জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর দক্ষিণ ভারতের 'বুদ্ধিজীবীদের' নিয়ে সভা করে জরুরি অবস্থার পক্ষে বিবৃতি দেন। তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে তিনি পর পর সাতবার লোকসভার নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং প্রথমবার (১৯৮৪) জয়লাভ করার পর থেকেই নানা মন্ত্রকের স্বাধীন রাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়া থেকে পূর্ণমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ড-এর অধিকারী।

রাজনৈতিক চিদাম্বরম সাহেবের চরিত্রের অন্য দিকটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। 'উদারিকরণ নীতি' যে উদার দুর্নীতির জন্মদাতা, চিদাম্বরম সেই আইনি মার্কা দেওয়া বেআইনি দুর্নীতির উদ্গাতাদের অন্যতম। ১৯৮৬তে তিনি ভারতের পেনসন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীনভাবে দপ্তর চালানোর ভার পেয়ে পেনসন-এর সুদের হার কমান। ১৯৯২-তে নরসিমা রাও তাঁকে পুনর্বহাল করেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে তিনি ভারতের আমদানি-রপ্তানি নীতিকে বিশ্বায়নের আদলে ঢেলে সাজিয়ে ভারতকে বিদেশি রদ্দি মালের গো-ডাউনে পরিণত করেন।

কংগ্রেসকে চাপে রাখতে তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ করে তামিলনাড়ুর কংগ্রেসের দল-ছুট তামিল মানিলা কংগ্রেস-এ যোগ দিয়ে নেতা হয়ে যান এবং তামিল মানিলা কংগ্রেসের হয়ে লোকসভা নির্বাচনে (১৯৯৬) নির্বাচিত হন এবং কেন্দ্রে গঠিত কোয়ালিশন সরকারে অর্থমন্ত্রীর পদ পান। তামিল মানিলা কংগ্রেস-এ ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করার বিশেষ সুযোগ না পেয়ে চিদাম্বরম অতপর মানিলা কংগ্রেস ছেড়ে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত 'কংগ্রেস জননায়কা পেরাতেই' নামক ছোটো রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ২০০৮-এর লোকসভা নির্বাচনে আসন সমঝোতা এবং আসন্ন লোকসভায় অর্থমন্ত্রীর পদ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি-র ভিত্তিতে তিনি তাঁর দলকে কংগ্রেস বিলীন করে দেন। পারিবারিক সূত্রে ব্যাংকিং ব্যবসার সঙ্গে চিদাম্বরমের যোগসূত্র বহুদূর বিস্তৃত। চিদাম্বরম-এর দাদু এবং মামা-দাদুরা ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক ও ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়াও বিমা ব্যবসায় তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির একটা বড় অংশ তারা লগ্নি করেছে তাদের নিজের প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানির মাধ্যমে। ইন্দিরা গান্ধীর কাছের মানুষ হওয়ার সুবাদে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আগাম খবর হস্তগত করেই চিদাম্বরম পরিবার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর যাবতীয় সম্পত্তি রাতারাতি সরিয়ে ফেলে ব্যাঙ্ক-এর ঘাড়ে শুধু দায়ভার চাপিয়ে দেয় (ব্যাংকিং পরিভাষায় একে বলা হয় যে ব্যাঙ্ক-এর শুধু 'নন পারফরমিং' অ্যাসেট রয়েছে, যা আসলে 'লায়াবিলিটি')। এর ফলে ঐ ব্যাংকের বিশাল সম্পত্তি চিদাম্বরম পরিবারের হাতেই থেকে যায়, ভারত সরকার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর দায় গ্রহণ ক'রে করদাতা জনগণের টাকার দায় মেটায়।

২০০৯ সালে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সময় ভারতের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৪টি বাড়ি সহ তার নিজস্ব সম্পত্তির পরিমাণ ১০ কোটি টাকা, তিনি কর্নাটকের একটি কফি বাগিচার মালিক। টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির কথা এখন সর্বজনবিদিত। এ রাজা এবং চিদাম্বরম মিলিতভাবে বিদেশি সংস্থা সোয়ান এবং ইউনিটেককে কোনও নিলাম ছাড়াই মোবাইল টেলিফোন পরিষেবার এক বিরাট পরিমাণ শেয়ার কম দামে বিক্রি করে দিয়েছেন। ঘটনার শুরু ২০০৬-এর অক্টোবরে। চিদাম্বরের মন্ত্রক মরিসাস-এর বি টি গ্লোবাল টেলিকমিউনিকেশন্ লিমিটেডকে ভারতে মোবাইল পরিষেবার ছাড়পত্র দেয়। সঙ্গে শর্ত ছিল যে বিটি-র অধীনস্থ সংস্থা এয়ারসেল-ম্যাক্সিস যেন তাদের শেয়ারের ৫ শতাংশ ভারতের অ্যাডভানটেজ স্ট্যাটেজিক কনসাল্টিং সংস্থার জন্য সংরক্ষিত রাখে। ঠিকই ধরেছেন— সংস্থাটির মালিকের নাম

শ্রী কার্তিক চিদাম্বরম— মন্ত্রীর শিল্পপতি পুত্র!

দিল্লির কমনওয়েলথ গেমসের কথা মনে পড়ছে? খারাপ ইমারতি দ্রব্য দিয়ে গাঁথা পারাপারের সাঁকো ভেঙে পড়া, স্টেডিয়ামের ছাদ দিয়ে জল পড়া ইত্যাদি! যে সব সংস্থাকে এই সব বরাত দেওয়া হয়েছিল, সেই বরাত দেওয়ার কমিটির সদস্য ছিলেন চিদাম্বরম— আর্থিক মঞ্জুরীর একমাত্র দায়িত্ব ছিলো তাঁরই।

১৯৯২-এ বিলগি্ রত্নাগর 'ফেয়ারগ্রোথ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড' নামে একটি আর্থিক সংস্থা খুলে বি(কু)খ্যাত শেয়ার-দালাল হর্যদ মেহতার মাধ্যমে সংস্থার শেয়ার বাজারে বিলি করার ব্যবস্থা করেন। চিদাম্বরম ও তদীয় পত্নী নীলিমা চিদাম্বরম এই সংস্থার ১০ টাকা দামের ১০,০০০ শেয়ার কেনেন। তখন বাজারে ঐ শেয়ারের দাম ছিল দশগুণ কিন্তু তিনি মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে এবং ঐ সংস্থাকে কিছু অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে কম দাম (অর্থাৎ 'আন্ডার ভ্যালু', যা ভারতীয় আইনমতে অপরাধ) দিয়ে 'কিনে' নেন। ব্যাপারটি জানজানি হওয়ার আগেই তিনি ঐ শেয়ার বেচে কম-বেশি ৫৫০ কোটি টাকা মুনাফা করে নেন। তারপর হর্যদ মেহতা নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় হলে চিদাম্বরম মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং নরসীমা রাও তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন।

২০০৪-এ কংগ্রেস সরকারের তিনি অর্থমন্ত্রী হন। সেপ্টেম্বর মাসে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালার উপক্রম করলে চিদাম্বরম দরাজ হস্তে আমজনতার পকেট কেটে সেই ব্যাঙ্ককে ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। বলাই বাহুল্য, আইডিবিআই-এর দুর্দশার কারণ ছিল তার ''নন-পারফর্মিং অ্যাসেট''— সাদা বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় ব্যাঙ্ক যাদের ঋণ দিয়েছিলো, তারা ঋণের টাকা শোধ না দিয়ে এবং বন্ধকী দ্রব্য বেআইনিভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছিলো। এই ৯ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৩ হাজার কোটি টাকা ছিল মার্কিন দুর্বৃত্ত সংস্থা, এনরনের ভারতীয় শাখা, ধাবল পাওয়ার করপোরেশনের নেওয়া খেলাপি ঋণ! চিদাম্বরম সাহেব ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এই এনরন সংস্থার উকিল হিসেবে ভারত সরকার তথা মহারাষ্ট্র রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিরুদ্ধে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট-এ মামলা চালিয়ে ধাবল সংস্থার জন্য এমন একটি চুক্তি সম্পাদনায় মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদকে বাধ্য করেন। যার ফলে ধাবলের বিদ্যুতের দাম বেশি হয়ে গেল। মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদ বেশি দামে ঐ করপোরেশনের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য থাকবে! এই তথাকথিত চুক্তির ভিত্তিতেই আইডিবিআই ধাবলকে বিপুল ঋণ দেয়!

২০০৩ পর্যন্ত চিদাম্বরম বেদান্ত রিসোর্স নামক আর এক দুর্বৃত্ত সংস্থার বোর্ড অফ ডিরেক্টর ছিলেন। তার আগে উড়িষ্যার নিয়ামতগিরিতে বেদান্ত সংস্থা যখন খনি ব্যবসায় স্থানীয় পরিবেশ দূষিত করছে, স্থানীয় আদিবাসীদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করছে, প্রশাসনকে উপেক্ষা করে নিজস্ব মাফিয়া বাহিনী মারফত বিশ্ববিদ্যালয় করার নামে খনি ব্যবসার জন্য জমি জবর-দখল করছে, তখন চিদাম্বরম এই সংস্থার উকিল হিসেবে স্থানীয় জনগণের দায়ের করা মামলা, এমন কি কর ফাঁকির জন্য বেদান্ত-র বিরুদ্ধে ভারত সরকারের দায়ের করা মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে, বেদান্ত-র পক্ষে সওয়াল করেন। এই বিষয়ে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার—

প্রশ্ন : *আপনি যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন না, তখন তো আপনি বেদান্তর উকিল হিসেবে কাজ করেছিলেন?*

চিদাম্বরম : হ্যাঁ, তাদের হয়ে একটা কর সংক্রান্ত মামলায় লড়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এখন কী সম্পর্ক? ... যদি একজন উকিল একজন খুনির হয়ে সওয়াল করে, তাতে কি প্রমাণিত হয় যে উকিলটি খুনিটির হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছে? (*তহেলকা*, মে ৩১, ২০০৮)

১৯৯৭ সালে চিদাম্বরম এক অভিনব কায়দায় ক্রাইম দুনিয়ার মাফিয়াদের কালো টাকা সাদা করার অভিপ্রায়ে 'ভলান্টারি ডিসক্লোজার অফ ইনকাম স্কীম' বা ভিডিআইএস নামে এক প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্প মতে আপনি এতদিন বেআইনিভাবে যে সম্পদ (যেমন বাড়ি, গাড়ি, সোনা, হীরে-জহরৎ, বিদেশি ব্যাঙ্ক-এ টাকা ইত্যাদি) লুকিয়ে রেখে আয়কর ফাঁকি দিয়েছিলেন, আপনি এখন নামমাত্র কর দিয়ে সেই কালো সম্পত্তিকে সাদা সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন! এই বেআইনি কাজের জন্য আপনার শাস্তি তো হবেই না, উল্টে আপনি আপনার দেয় কর-এ প্রচুর ছাড়ও পাবেন! ভারতের কম্পট্রোলার জেনারেল এই প্রকল্পটিকে 'কালো প্রকল্প' বলে আখ্যা দিয়ে এটির বেআইনি দিকের প্রতি 'কমিশনের' দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে চিদাম্বরম শিবগঙ্গার অনেকগুলি অঞ্চলে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ক্রমাগত পেছিয়ে যাচ্ছিলেন। দক্ষিণী দৈনিক 'দি হিন্দু' নানা দলিল ছেপে প্রমাণ করে যে চিদাম্বরম নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারকে হুমকি এবং অন্যান্য সুবিধার লোভ দেখিয়ে তাঁর পক্ষে ফল প্রকাশে বাধ্য করেন। পরাজিত প্রার্থী এআইডিএমকে-র কান্নাপান পুনরায় ভোট চেয়ে আবেদন করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

শেষ করার আগে একটি বিশেষ খবর দেওয়া যাক। চিদাম্বরম-এর স্ত্রী, প্রখ্যাত উকিল, ভারত সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে অর্থমন্ত্রকের নানা মামলায় পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করেন। বিশেষত সেই সমস্ত মামলার, যার ফয়সালা আগেই সংবিধানিক বেঞ্চ করে দিয়েছে। ফলে মামলাগুলিতে ভারত সরকার হারে কিন্তু পরামর্শদাতার পকেট বিপুল টাকায় পূর্ণ হতে থাকে। বিষয়টি জানাজানি হলে অর্থমন্ত্রী শ্রী চিদাম্বরম বলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রী-র নিয়োগের বিষয়টি জানতেন না।

পরিবারতন্ত্র চালিত ইন্ডিয়াতে এই ট্র্যাডিশন সমানেই চলছে, বুভুক্ষ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে শোষণ করে!

সমরেশ মিত্র

বিজাপুর নরমেধ—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আহুতি

২৮ জুন ২০১২ রাতে ছত্তিশগড় রাজ্যের বিজাপুর জেলার তিনটি গ্রাম সারকেগুড়া, কোট্টাগুড়া ও রাজপেন্টা গ্রামে ঠান্ডা মাথায় গুলি চালিয়ে এক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, যা কেবল তুলনীয় জালিয়ালাবাগের কুখ্যাত গণহত্যার সঙ্গে। বিগত শতাব্দীর '৮০ দশকে বিহারের গয়া জেলার আরওয়ালে মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত একটি মাঠে এই ধরনের গণহত্যার নজির আছে। দুটি গণহত্যাই সংঘটিত হয়েছিল দিনের বেলায় দুটি রাজনৈতিক সমাবেশের উপর পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে। আর ছত্তিশগড়ের সদ্য ঘটে যাওয়া গণহত্যাটি সংঘটিত হয়েছে রাতে। ডরলা কোয়া উপজাতীয় মানুষদের ফসলবোনার উৎসবের জন্য আয়োজিত একটি গ্রামসভায় নির্বিচারে, কোন সতর্কীকরণ ছাড়াই গুলিবর্ষণে।

যথারীতি পরদিন, অর্থাৎ ২৯ জুন, সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলের হেডলাইন খবর হয় ঘটনাটি। এবং অবশ্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (তৎকালীন) পালিয়াপ্পান চিদাম্বরম ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর বিজয়োল্লাস সহ। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে 'সবুজ-মৃগয়ায়' সাম্প্রতিক কালের বৃহত্তম সাফল্য পাওয়ার জন্য চিদাম্বরম ও রমণ সিং সিআরপিএফ-কোরবা-পুলিশবাহিনীর উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বৃষ্টি করেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সংগঠনগুলি, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মীরা বিরুদ্ধাচারণ শুরু করার আগেই চিদাম্বরমের ক্যাবিনেটে সহকর্মী আদিবাসী দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর চন্দ্র দেও এই সংঘর্ষের ঘটনাকে "ভুয়ো সংঘর্ষ" বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন "গ্রামবাসীদের একজনও সশস্ত্র ছিল না। সিআরপিএফ বুলেটের চোখ থাকে না। কিন্তু যে মানুষ গুলি ছুঁড়ছে তারা যদি অন্ধ হয়, তাদের গুলি ছোঁড়া উচিত নয়। যদি অন্ধকার হয়, নাইট ভিশন যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। যদি তা না থাকে, রাত্রে যাওয়া উচিত নয়।"

২৮ জুন ২০১২ রাতে সারকেগুড়ায় মৃতদের তালিকার দিকে চোখ রাখলে চিদাম্বরম-রমন সিং-এর দাবির 'সত্যতা' যাচাই করা যাবে। সিডিআরও (কোঅর্ডিশেন অফ ডেমোক্রাটিক রাইটস অরগানাইজেন্স) রিপোর্ট অনুযায়ী কোট্টাগুড়া, সারকেগুড়া ও বাজবেন্টা গ্রামে ঐ রাতে মৃতের সংখ্যা ১৭ জন ও আহতের সংখ্যা ৭ জন।

মৃত ও আহতদের মধ্যে ৯ জনের বয়স ১১ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। মৃতদের মধ্যে দুজন ছাত্র, মাদকম রামবিলাস ও কাকা নাগেশ, এ বছর জানুয়ারী মাসে বিশাখাপত্তনম গিয়েছিলো স্কুলের শিক্ষামূলক ভ্রমণে সমুদ্র দেখতে। তারা স্বপ্ন দেখেছিলো ভবিষ্যতে নাবিক হবে। যদিও তাদের স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে ২৮ জুন ২০১২ রাতে সারকেগুড়ায় পুলিশের গুলিতে। তাদের যে বন্ধুরা-ভাইয়েরা-বোনেরা বেঁচে রইল তারা যে ভবিষ্যতে উধম সিং হয়ে উঠবে না তার নিশ্চয়তা কি?

চিদাম্বরম-রমন সিংরা পারবেন তো ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিন্তে কাটাতে?

চিদাম্বরম ও কিশোর চন্দ্র দেও মন্ত্রীদ্বয়ের কাজিয়ায় যে নিরপরাধ আদিবাসীরা নিহত হলেন— তার কোন সুরাহা হবে না। স্বামী অগ্নিবেশ যতই দাবি করুন বিচার বিভাগীয় তদন্তের— চিদাম্বরম ও মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং প্রথমে এই দাবি নস্যাৎ করে দেন। কারণ ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। রমন সিং আরও বলেছেন "মাওবাদীরা স্কুল ছাত্রদের ঢাল হিসেবে অতীতে ব্যবহার করেছে। তারা স্কুলের পোশাক পরে ঠকানোর চেষ্টা করে। আমি নিশ্চিত এটা ভুয়ো সংঘর্ষ নয়।" প্রাক্তন সলিসিটর জেনারেল সলি সোরাবজী অবশ্য বলেছেন স্বাধীন তদন্ত করলেই সিআরপিএফ-এর গল্প খণ্ডন করা যাবে।

মৃতদের সংখ্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠনগুলির তথ্যানুসন্ধানী দলের (সিডিআরও) দেওয়া তথ্যে কিছু ফারাক আছে। সিডিআরও দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২৮ জুন রাতে গুলিতে নিহতের সংখ্যা ১৭ বলা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিবেদন থেকে এটা পরিষ্কার যে গুলি চালানো হয়েছিলো নিরস্ত্র আদিবাসীদের উপর। আর গুলি চলেছিলো চার দিক থেকে। যে মাঠে 'বীজ পোনদুম' প্রস্তুতির মিটিং বসেছিলো তার আশপাশের গাছে রয়েছে গুলির চিহ্ন। বাড়ির দেওয়ালে রয়েছে গুলির চিহ্ন। কয়েকটি গবাদি পশু গুলিতে আহত হয়েছে।

কোনভাবেই মাওবাদীদের সাথে সংঘর্ষের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে সিআরপিএফ-পুলিশ বাহিনীর উর্দ্ধতন অফিসাররা এখন বলছেন, "দুর্ভাগ্যজনক পারস্পরিক ক্ষতি" এবং ভবিষ্যতে দেখতে হবে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। যদিও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সিডিআরও (Co-ordination of Democratic Rights Organisation) তদন্তকারী দল নিশ্চিত যে সিআরপিএফ-কোবরা বাহিনী গুলি চালিয়েছিল হত্যা করার জন্যই। কারণ মিটিং-এর জায়গা আর বাহিনীর মধ্যে দূরত্ব ছিল ১০০ মিটারের মধ্যে।

চাপে পড়ে অবশেষে ছত্তিশগড় সরকার একজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও আদিবাসীরা বলছেন গ্রামে বা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করলেই সত্য ঘটনা উদঘাটিত হবে। সিডিআরও তদন্তকারী দলের উপস্থিতিতে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট চাল, ডাল, বস্ত্র, বাসন-কোসন

নিয়ে ত্রাণ দিতে গেলে আদিবাসীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের সাফ কথা: "তোমরা আমাদের বাচ্চাদের মেরেছ আর এখন এসেছো আমাদের সাহায্য করতে"! "আমরা তো মাওবাদী! তোমরা মাওবাদীদের সাহায্য করতে এসেছ?"

আইনরক্ষকদের আইন রক্ষার আর একটা উদাহরণ হচ্ছে ২৮ জুন রাতে সংঘর্ষে নিহতদের ময়না তদন্তের বিষয়টি। আইন অনুযায়ী যে কোন অস্বাভাবিক মৃত্যুরই ময়নাতদন্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত হয়েছে বাসাগুড়া থানায়। বীজাপুরের পুলিশ সুপারের বক্তব্য: "যথোপযুক্ত ময়নাতদন্ত করেছে ডাক্তারদের একটি দল বাসাগুড়া থানায়"। মৃতদের আত্মীয়দের বা গ্রামবাসীদের বক্তব্য: মৃতদেহগুলিতে কোন কাটা-ছেঁড়ার দাগ ছিল না। আর হসপিটালের পরিবর্তে থানায় ময়নাতদন্ত! 'গণতান্ত্রিক' আইন সন্দেহ নেই।

আর এভাবেই গুলিতে নিহত আদিবাসীরা। অবশ্য 'গণতান্ত্রিক রীতিনীতি' মেনে বিচারবিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা হয়। বছরের পর বছর পেরিয়ে যায় তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হতে। আর ভারতীয় গণতন্ত্রে মোট নাগরিকদের মধ্যে উপজাতি-আদিবাসীরা সংখ্যায় মোটে ৮.৫ শতাংশ। তার মধ্যে আবার ডরলা-কোয়ারা সংখ্যায় আরও নগণ্য। কিন্তু এরা বাস করে ছত্তিশগড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। যেটা নাকি খনিজ সম্পদের বিচারে দুনিয়ার অন্যতম সেরা অঞ্চল। সুতরাং রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার, এনডিএ বা ইউপিএ যেই হোক না দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা দেশি/বিদেশি করপোরেটদের হাতে তুলে দেবার জন্য এককাট্টা। সুতরাং ১৭ বা ২২ জন ডরলা কোয়া আদিবাসী গোষ্ঠীর নিতান্ত গরীব গণতন্ত্রের তন্ত্রধারকদের গণতান্ত্রিক নিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটবে এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই।

শ্যামল দাস

দারিদ্রে ডুবছে দেশ

নয়া উদারনীতি অনুসরণ করে দুদশক ধরে চলতে থাকা আর্থিক সংস্কার যে দেশের বেশির ভাগ মানুষকে চরম দারিদ্রে ঠেলে দিয়েছে ও দিচ্ছে তা ফের প্রমাণিত হলো জাতীয় নমুনা সমীক্ষায়। সদ্যসমাপ্ত ২০১১-১২ আর্থিক বছরের ভোগ্যপণ্যে গৃহস্থালি খরচের ভিত্তিতে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সর্বশেষ ৬৮তম রাউন্ডে প্রকাশ, সাধারণ ভারতবাসীর জীবনে দারিদ্র্যই চরম সত্য।

দেশে দারিদ্র কতখানি তীব্র তা জানা যাচ্ছে এই সমীক্ষার তথ্য থেকে। ভারতের ১০ শতাংশ দরিদ্রতম গ্রামবাসীর সারা দিনের চাহিদা মেটাতে খরচ করার ক্ষমতা মাত্র ১৬.৭৮ টাকা। শহরের ক্ষেত্রে ২৩.৪০ টাকা। দুটি হিসেবই যোজনা কমিশনের বেঁধে দেওয়া দারিদ্রসীমার অনেক নিচে। যোজনা কমিশন বলেছিল, গ্রামে কমপক্ষে ২২.৪২ টাকা ও শহরে অন্তত ২৮.৬৫ টাকা যারা খরচ করতে পারে না তারাই দরিদ্র।

এই সমীক্ষা থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে ৫০ শতাংশ বা অর্ধেক গ্রামবাসীর দৈনিক খরচের পরিমাণ গড়ে ৩৪.৩৩ টাকা। আবার উল্টো দিক দিয়ে দেখলে দিনে ৩০ টাকার বেশি খরচ করতে পারেন না গ্রামবাসীদের ৪০ শতাংশ। এই টাকাতেই তাদের শুধু যে চাল-ডাল-খাবার কিনতে হয় তাই নয়, কিনতে হয় জ্বালানি, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, কখনো ঘরের চাল ছাইতে হয়, কখনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। নেহাত যাদুকর না হলে এই টাকায় এগুলি করা অসম্ভব। তাই দারিদ্র মানে এখানে পেটভরে খেতে না পাওয়া, শীতে বস্ত্র না জোটা, বর্ষায় ফুটো চাল দিয়ে জল পড়া, চিকিৎসা বা শিক্ষার জন্য খরচের অসামর্থ্য।

দেশবাসীর গড় আয় থেকে এই দারিদ্রের প্রকোপের কথা বোঝা যায় না। কেন যায় না তাও এই সমীক্ষার তথ্য থেকেই জানা যাবে। কারণ হলো, যত ওপরের দিকে ওঠা যায়, ব্যয়ক্ষমতা ততই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। আর উচ্চশ্রেণীর সেই ব্যয়ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়েই সরকার প্রচার করে, উদারনীতিতে লোকের ব্যয়ক্ষমতা বাড়ছে, এদেশের মল-বিহারী উচ্চশ্রেণীর এই আর্থিক ক্ষমতার দিকেই লোলুপ দৃষ্টি দেশের বড় কোম্পানিগুলি থেকে শুরু করে বিদেশি কোম্পানিগুলির, কোকাকোলা থেকে গাড়ি কোম্পানির, ব্রান্ডেড শার্ট থেকে রিয়েল এস্টেট বিক্রেতাদের।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যে দেখা গেল, গ্রামের দরিদ্রতম ১০ শতাংশ মানুষের তুলনায় ৭ গুণ খরচের ক্ষমতা ধরেন গ্রামের সম্পন্ন ১০ শতাংশ। শহরে তা ১১ গুণ। শহরে নিচুতলার ১০ শতাংশের দৈনিক মাথাপিছু ব্যয় যেখানে ২৩.৪০ টাকা সম্পন্ন ১০ শতাংশের দৈনিক ব্যয় সেখানে মাথাপিছু ২৫৫ টাকা।

গ্রাম ও শহরের ফারাকও চোখে পড়ার মতো। গ্রাম-ভারতের ধনীরা যেখানে মাসে গড়ে মাথাপিছু প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ করতে পারে, সেখানে শহরের বিত্তবানদের মাথাপিছু মাসিক খরচ সাড়ে সাত হাজার টাকার বেশি।

নয়া উদারনীতির প্রবক্তাদের মতে, এর সুফল নাকি নিচের তলার মানুষদের কাছেও আসবে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে। যত দিন যাচ্ছে প্রমাণিত হচ্ছে যে সেকথা সর্বৈব মিথ্যা।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

স্মরণ

ঝাঁসি-বাহিনীর লক্ষ্মী

অক্টোবর ২৪, ১৯১৮ তৎকালীন মাদ্রাজ শহরে এক শিক্ষিত, স্বচ্ছল, আধুনিকমনস্ক পরিবারে জন্ম নেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন (পরবর্তী জীবনে লক্ষ্মী সায়গল)। ১৯৩৮ সালে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সময় ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্বামীনাথনের পুরো পরিবার দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন। বিদেশি বস্ত্র বয়কট আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁদের পরিবারে বিদেশি বস্ত্র পোড়ানো হয়। লক্ষ্মী সায়গলের পরিবারে কংগ্রেসি সাংসদ থাকলেও লক্ষ্মী সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯৪০ সালে ২৬ বছর বয়সে লক্ষ্মী সিঙ্গাপুর উদ্দেশে পাড়ি জমান। সিঙ্গাপুরে সেই সময় অনেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচারের কাজে কেশব মেনন, এস সি গুহ প্রমুখ অনেক নেতাই লিপ্ত ছিলেন। সিঙ্গাপুরে ডাক্তারি করার সময় ১৯৪৩-এ সুভাষ চন্দ্র বসু সেখানে এসে প্রবাসী ভারতীয় ও জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। সুভাষচন্দ্রের একটি বক্তৃতায় কেবলমাত্র একটি নারী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনার কথা শুনে তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী আলোচনার পর লক্ষ্মীর নেতৃত্বে রাণী ঝাঁসি বাহিনী গড়ে ওঠে। ডাক্তার লক্ষ্মী হয়ে ওঠেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর সাংগঠনিক দক্ষতায় রাণী ঝাঁসি বাহিনীর আয়তন বাড়তে থাকে। সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে ঝাঁসি বাহিনীর নারী সৈনিকরা সামরিক প্রশিক্ষণ পেতে শুরু করেন। এঁদের থেকে ৫০০ জন আরও তীব্র সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মার্চ ১৯৪৪-এ নিয়মিত সৈনিকের সম্মান লাভ করেন। সুভাষচন্দ্র যে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেন, লক্ষ্মী ছিলেন সেই সরকারের একমাত্র মহিলা মন্ত্রী।

সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে কেবলমাত্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা ইম্ফল ও কোহিমা অভিযান করেন, জাপানি সৈন্যরা কেবলমাত্র পশ্চাৎভূমি রক্ষার কাজ করেছিল। ঝাঁসি বাহিনীর ১০০ জন নারী সৈনিক লক্ষ্মীর নেতৃত্বে বার্মার মেমো শহরের উপস্থিত হয়ে বাংলায় ঢোকার আয়োজন শুরু করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হয়— মিত্রপক্ষের তীব্র বিমান আক্রমণে আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়। লক্ষ্মীর নেতৃত্বে ঝাঁসি বাহিনীর নারী সৈনিকবৃন্দ আহত সৈনিকদের ত্রাণ ও চিকিৎসায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। লক্ষ্মী ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়েন। পরে দেশ জুড়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে যে উত্তাল আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে ভীত হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় জ্যোতি বসু প্রমুখের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ্মী সায়গল পশ্চিমবাংলার সীমান্ত অঞ্চলে চিকিৎসা ও ত্রাণের কাজে প্রায় দেড় মাস কাটান। ঐ বছরেই উনি সিপিআইএম দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং রাজ্যসভার সদস্য হন।

১৯৮১ সালে যখন সারা ভারত মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি ছিলেন সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। ১৯৮৪ সালে ভূপাল গ্যাস কাণ্ডের পর তিনি ভূপালে গিয়ে মানুষের ওপর 'মিক' গ্যাসের প্রভাব নিয়ে একটি প্রামাণ্য রিপোর্টও প্রস্তুত করেন। ১৯৮৪-র শিখ নিধন যজ্ঞের পর তিনি কানপুর শহরে দাঙ্গা থামানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৯৬-এ যখন ভারতে 'মিস ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতার তোড়জোড় শুরু হয় তখন তিনি মহিলা সমিতির হয়ে বিক্ষোভ দেখানোর সময় গ্রেপ্তার বরণ করেন। ২০০২ সালে চারটি বামপন্থী দল তাঁকে কালাম-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করে। হার নিশ্চিত জেনেও তিনি এই সুযোগকে সারা ভারত সফর করে গুন্ডারাজ ও নীতিহীন রাজনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করার কাজে লাগান। তাঁর বয়স যখন ৯২, তখনও তিনি নিয়মিত ডাক্তারি করতেন।

১৯ জুলাই ২০১২ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ৯৭ বছর ধরে যে মানুষটি নানান বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি নিয়ে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন, সেই সংগ্রামের অবসান হয় ২৩ জুলাই দুপুরে। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর মরদেহ কানপুর মেডিকেল কলেজে দান করা হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার জন্য।

মুক্তিবাহিনীর সৈনিক হয়ে স্বাধীন ভারতে কুচকাওয়াজের স্বপ্নে বিভোর ২৬ বছরের যুবতীটি তাঁর মাতৃভূমির উদ্দেশে এক দুরন্ত যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই যাত্রার কারণ এখনও রয়ে গেছে। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন। যতদিন সেই ইতিহাস আমাদের প্রাণিত করবে, লক্ষ্মী সায়গলের কথা ভোলা যাবে না।

প্রবন্ধ

জঙ্গলমহলে মাওবাদী রাজনীতি

বিশ্বজিৎ রায়

পর্ব - ৩

লালগড় আন্দোলন : স্থানীয় চোখে

জঙ্গলমহল বা লালগড় আন্দোলন নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্কের ফাঁকে স্থানীয় কিছু কণ্ঠস্বর এখানে হাজির করছি। এটা জেনেই যে এঁদের বাইরেও থেকে গেলেন বহু মানুষ, যাঁদের কাছে আমি পৌঁছোতে পারিনি।

যেসব গ্রামে গিয়েছি, সর্বত্রই সাধারণ মানুষ জনসাধারণের কমিটি এবং মাওবাদীদের সম্পর্কে মিশ্র মূল্যায়ন শুনিয়েছেন। তাঁরা একদিকে আন্দোলনকারীদের বিকল্প উন্নয়ন-প্রচেষ্টা ও সেবামূলক কাজকর্মের প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে আন্দোলনের একটি বিশেষ পর্যায় থেকে নির্বিচার খুনোখুনি, অন্যবিধ জবরদস্তি ও হুকুমবাজির নিন্দাও করেছেন। আগে প্রশংসার কারণগুলি জেনে নেওয়া যাক।

ঝাড়গ্রামের লাগোয়া শিরসি, কইমা, চণ্ডীপুর, বোরিয়া বা লালগড়-কাঁটাপাহাড়ি-বেলপাহাড়ির মানুষ মাওবাদীদের নেতৃত্বে কমিটির মদ-বিরোধী অভিযান, ফ্রি-ক্লিনিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং স্থানীয় উদ্যোগে গ্রামীণ উন্নয়নের নানা কর্মসূচির কথা শুনিয়েছেন। শিরসির তরুণী গৃহবধূ বালিকা মাহাতো ও পুতুল মাহাতো জানালেন, মেয়েরা খুব খুশি ছিলেন মাওবাদীদের সামাজিক উদ্যোগে। "ওরা মদ বিক্রি আর মদ খাওয়া অনেকটাই কমিয়েছিল। নেশা-ভাঙ করে এসে বৌ পেটানোর ঘটনাও বন্ধ হয়েছিল অনেকটা। শুধু তাই নয়। ওরা বাবা-মায়েদের বোঝাতো ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য। নিজেরা কোচিং ক্লাসও খুলেছিল" —তাঁরা জানালেন। প্রতিবেশিনী মনোরমা মাহাতো বললেন, "ওরা রাতে গাঁয়ে আসতো। যা দিতাম তাই খেত। কখনও জোরজবরদস্তি করেনি খাবার নিয়ে।" চণ্ডীপুরের মানুষ জানালেন, পাঁচ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে ফ্রি-ক্লিনিকে চিকিৎসা পেতেন তাঁরা। ঝাড়গ্রাম হাসপাতাল আর মোহনপুর হেল্‌থ সেন্টার থেকে অনেক দূরের ১২টি গ্রামের মানুষ এতে উপকৃত হতেন। স্থানীয় হাতুড়েদের সঙ্গে কলকাতার ডাক্তারবাবুরাও আসতেন। যৌথবাহিনী এলাকা দখল করার পর ক্লিনিকটি বন্ধ করে দেয়। বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তারও হন। এমনই হেল্‌থ সেন্টার গড়া হয়েছিল চাকাডোবা সহ কয়েকটি জায়গায়। নারী ইজ্জত বাঁচাও কমিটির অন্যতম সংগঠক জ্যোৎস্না মাহাতোর কাছেও শুনেছি ওঁর গ্রামের কাছে এমনই এক চিকিৎসা কেন্দ্রের কথা। কটক থেকে নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে আসা জ্যোৎস্না সেখানে ওষুধপত্র গুছিয়ে রাখা এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে তা বিলি করতেন। "নিজেদের উদ্যোগে এই ক্লিনিক চলত। বাইরে থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবীরা সাহায্য করতেন। কাজটায় যুক্ত হয়ে মন ভরে গিয়েছিল" — জানালেন জ্যোৎস্না।

গ্রামোন্নয়নের কাজে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গ্রামবাসীদের সমবেত উদ্যোগের কথাও মনে করেছেন অনেকে। ছোটপেলিয়ার আদিবাসী মানুষের কাছে দলিলপুর চক পর্যন্ত মেঠো রাস্তা সম্প্রসারণের কাহিনী শুনেছি। শিরসি-বোরিয়ার মানুষও বলেছেন জঙ্গলবতী গ্রামের সঙ্গে পাকা সড়কমুখী কাঁচা রাস্তার উন্নয়নে কমিটি-মাওবাদীদের সাহায্যের কথা। সময়াভাবে রামেশ্বরপুর যেতে পারিনি। তবে ওই অঞ্চলে সমবায়িক প্রথার চাষের উদ্যোগের কথা শুনেছি। তেমনই শুনেছি বর্ষার জল ধরে রাখার প্রচেষ্টার কথাও।

এইসব উদ্যোগগুলির আনুপূর্বিক বিবরণ আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকদের তরফে ধরে রাখা জরুরি। এ নিয়ে অমিত ভট্টাচার্য সহ কয়েকজনের লেখায় টুকরো বিবরণ আছে। ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের 'জনাতনা' সরকারের এলাকায় এ ধরনের উদ্যোগের কথা জানা আছে।

উন্নয়ন, পঞ্চায়েত ও গণউদ্যোগ

মাওবাদীদের এ ধরনের উদ্যোগের পিছনে তাঁদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিতর্ক অনেক। সরকারপক্ষ এবং মাওবাদীদের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলির বক্তব্য : এ সবই মাওবাদীদের জনসমর্থন পাওয়ার কৌশলমাত্র। গ্রামোন্নয়নে তাঁরা প্রকৃত আগ্রহী হলে পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে দিতেন না। স্কুলবাড়ি, রাস্তাঘাট, পঞ্চায়েত অফিস বা কমিউনিটি সেন্টারগুলি ধ্বংস করতেন না। ছত্তিশগড়ের প্রেক্ষিতে মাওবাদী নেতৃত্ব এর জবাবও দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য: স্কুলবাড়ি সহ অন্যান্য সরকারি ভবন সিআরপিএফ-বাহিনীর শিবিরে পরিণত করা হয়েছে। রাস্তাঘাটও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্রুত চলাচলের জন্য সম্প্রসারিত। আদিবাসী-মূলবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন বা অপারেশন 'গ্রিন হান্ট'-এর মতো হত্যাভিযান বন্ধ করতে গেলে এগুলি ধ্বংস করতেই হবে। পঞ্চায়েতগুলিও দুর্নীতির আখড়া। মাওবাদীদের নেতৃত্বে জনগণের সরকারের কর্তৃত্ব কায়েম করতে গেলে 'পিপলস পাওয়ার'-এর ভিন্নতর কেন্দ্র বা সাংগঠনিক ধাঁচা দরকার। আর তার মূল কথা: পিএলজিএ-র ছত্রছায়ায় নানাবিধ জনগণের কমিটির নজরদারিতে গ্রামবাসীদের নিজস্ব উন্নয়ন-উদ্যোগ। সমালোচকদের মতে, এই যুক্তিজালের মোদ্দা কথাটা হল: রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল বা মুক্তাঞ্চল/ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের আগে গ্রামের উন্নয়ন তথা গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন সমস্যার আশু সমাধানের

বিষয়টি আপেক্ষিক। মাওবাদীদের সামরিক লাভালাভের গুরুত্বই প্রধান। সরকার যা করবে সেটা খারাপ। ওঁরা যা করবেন সেটা ভালো। সিপিআই(মাওবাদী)-র রাজ্য কমিটির সম্পাদক আকাশের এক সাক্ষাৎকারে পড়েছি, তাঁরা পার্লামেন্ট থেকে পঞ্চায়েত কোনও নির্বাচিত সংস্থাকেই গণতান্ত্রিক বলে মনে করেন না। তা সত্ত্বেও পঞ্চায়েতী ফান্ড-এর উপর তাঁরা জনতার নিয়ন্ত্রণ চান এবং এর ব্যয় সম্পর্কে জনশুনানিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী।

ঘটনা হচ্ছে, পঞ্চায়েতী-রাজ আইনে গ্রাম সংসদে গ্রামের সব মানুষের উপস্থিতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ষাণ্মাষিক আর্থিক বিবরণ আলোচনা ও অনুমোদনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সিপিএম জমানায় প্রাতিষ্ঠানিক দলবাজি এবং পঞ্চায়েতসহ গ্রামীণ ক্ষমতাতন্ত্রের সর্বস্তরে দলীয় নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ করার রাজনীতি গ্রাম সংসদের প্রতি গরিব মানুষকে বিমুখ করেছে। পঞ্চায়েতগুলি পার্টির লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। দলদাসতন্ত্র আর পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি গ্রামের গরিব মানুষের মধ্যেও বিভাজন ঘটিয়েছে। পরিবর্তিত জমানায় এর পুনরাবৃত্তিই ঘটছে। আপাতত জেলাশাসক বা বিডিও-দের ক্ষমতা বাড়িয়ে বিরোধীদের নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েতকে এড়িয়ে তৃণমূলের ভোটব্যাংক বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে নয়া শাসকদলের মৌরসিপাট্টা কায়েম হলেও গ্রামোন্নয়নে গ্রামের মানুষের সমবেত সিদ্ধান্তগ্রহণ, অংশীদারি ও নজরদারির গণতান্ত্রিক স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। কিন্তু এর বাইরে মাওবাদীরা জনগণের নিয়ন্ত্রণের যে মডেল হাজির করেছেন, তাতেও আশান্বিত হওয়ার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। জনসাধারণের কমিটির শুরুর পর্বের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গ্রামভিত্তিক কাঠামোটি বাদ দিলে আন্দোলনের গোটাটাই মাওবাদী নেতৃত্ব ও দলের সশস্ত্র স্কোয়াডের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের কাহিনী। কখনও তা কমিটির বকলমে, কখনও সরাসরি। গণ-আন্দোলন, গণসংগঠনের বা গণ-ক্ষমতার কেন্দ্রগুলির উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে সিপিএম এবং সিপিআই(মাওবাদী)-র কোনও ফারাক লালগড় আন্দোলনে দেখা যায় নি। এটা অবশ্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের গভীর অসুখগুলির অন্যতম। সেই সোভিয়েত বিপ্লব থেকে যার শুরু। তবে সে বিতর্কে এখানে যাওয়ার অবকাশ নেই।

আপাতত জঙ্গলমহলের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির দুর্নীতি ও দলবাজি সত্ত্বেও তাদের উপর আমজনতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে সরকারি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য-দূরীকরণ কর্মসূচিতে বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যবহার করার লক্ষ্যে কোনও পরিকল্পিত উদ্যোগ মাওবাদীরা নেননি। বরং বহু প্রকল্পের কাজ তাঁরা বন্ধ করে দেন— বিরোধীদের অভিযোগ এমনটাই। এর মধ্যে এনআরইজিএ প্রকল্পের কাজও রয়েছে। রামগড় নয়-নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকলাল বাস্কে, সিজুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আশিস কুন্ডুর মতো ঝাড়খন্ডিরা বা বেলপাহাড়ির সুব্রত ভট্টাচার্যের মতো কংগ্রেস নেতারা জানিয়েছেন কিছু কিছু জায়গায় আইসিডিএস বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাস্কে জানালেন : ''প্রথম দিকে ওরা উন্নয়নের কাজে বাধা দিত না। তবে ওরা যা বলতো তাই মেনে চলতে হত। নইলেই সমস্যা হত। গ্রামের সব মানুষকে ডেকে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে কখনও আলোচনা হয়নি।'' বিরোধীরা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেননি। তবে স্থানীয়ভাবে সংঘাত বেঁধেছে ১০০ দিনের কাজের মজুরি নিয়ে। ''তখন মজুরি ছিল ১৩০ টাকা। কমিটি ও মাওবাদী নেতারা ১৫০ টাকার দাবি তোলেন। সরকারি রেটের বেশি দিতে না পারায় বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়'' —বাস্কে জানালেন।

মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন নিঃসন্দেহে সঠিক পদক্ষেপ। এবং তা কমিটি ও মাওবাদীদের জনভিত্তি সম্প্রসারিত করেছে। কিন্তু এই আন্দোলনকে সংগঠিত করে সরকার এবং সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে চাপ দিয়ে কমিটির প্রভাবাধীন সর্বত্র মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টা হয়নি। যেটা সলতে পাকানোর পর্বে বেলপাহাড়ি-শিমূলপাল-ভুলাভেদা অঞ্চলে এমসিসি এবং জনযুদ্ধ গোষ্ঠী আলাদাভাবে করেছিলেন। পরবর্তী পর্বে তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অভিমুখ ছিল গেরিলা জোন গঠনের লক্ষ্যে এলাকায় নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক সামরিক নিয়ন্ত্রণ। মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন বা পঞ্চায়েতী তহবিল ব্যবহার করে গ্রামোন্নয়ন সংস্কারবাদী রাজনীতিজ্ঞানে পরিত্যাজ্য হয়। এই প্রশ্নে মাওবাদী নেতৃত্বের বক্তব্য জানার সুযোগ পাইনি। কমিটির শীর্ষ নেতৃত্ব জেলবন্দী। যাঁরা জামিনে মুক্ত হয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তাঁরা ওই পর্ব সম্পর্কে মুখ খুলতে চান না। আন্দোলনের সহমর্মী কর্মীরা এব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতা লিখলে স্পষ্ট ছবিটা পাওয়া যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে সঙ্গী অধ্যাপিকা নন্দিনী সুন্দরের একটি মন্তব্য আমার প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে। ছত্রিশগড়ে তাঁর সরেজমিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নন্দিনীর মূল্যায়ন: আমজনতা সরকার ও মাওবাদী দুই পক্ষকেই চায়। সরকারের হাতে টাকা এবং ক্ষমতা। জনতার দৈনন্দিন সমস্যার সুরাহা করার দায়দায়িত্ব ও বিলি-বন্দোবস্তের ব্যবস্থা তাদেরই। অন্যদিকে মাওবাদীরা পুলিশি নিপীড়ন, বাবুতন্ত্রের দুর্নীতি, সামন্তশোষণ আর কর্পোরেট লুটপাটের বিরুদ্ধে আমজনতার পাশে দাঁড়াতে পারে। বন্দুকের জোরে চটজলদি কিছু সমস্যার সমাধানও তারা করে ফেলে। বলা বাহুল্য, মাওবাদীরা এহেন মূল্যায়নে মোটেই খুশি হবেন না।

জবরদস্তি

সাধারণ মানুষের ক্ষোভের একটা বড় কারণ জনসাধারণের কমিটির সভা-সমাবেশ-মিছিলে যোগদানের জন্য জবরদস্তি।

সর্বত্র এই অভিযোগ শুনেছি। মাইলের পর মাইল হাঁটতে বাধ্য করা হত, কখনও রাত-বিরেতে কখনও দুপুর-রৌদ্রে। "প্রত্যেক ঘর থেকে দুজন করে যাওয়ার নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল ওরা। না গেলেই কৈফিয়ৎ দিতে হত। মারধোরও হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন চৌপাট হয়ে গিয়েছিল" —বললেন শিরসি-র রতন মাহাতো, গুরুচরণ মাহাতোরা। সিজুয়া-য় দাসমত মুর্মু, শীতল হাঁসদার মতো আদিবাসী মানুষ বা স্বপন চালক ও সাধন পাত্রের মতো অন্যরাও এই অভিযোগ করেছেন। পঞ্চায়েত সঞ্চালক আশিস কুন্ডুর অভিযোগ: "ধরমপুরে অনুজ পান্ডের বাড়ি ভাঙ্গার সিদ্ধান্তের কথা আমরা জানতাম না। মিছিলে যাওয়ার নির্দেশ মোতাবেক গেছি। হঠাৎ দেখি বিকাশের (মাওবাদী নেতা) নেতৃত্বে বাড়ি ভাঙ্গা হচ্ছে। বিকাশ বন্দুক ঝুলিয়ে টিভিওয়ালাদের বলছে মাওবাদী-নেতৃত্বে কমিটির আন্দোলন চলছে। এতেই বুদ্ধবাবুদের যৌথবাহিনী পাঠানোর রাস্তা খুলে গেল। আমাদের উপর অত্যাচার নামল। কমিটি বা মাওবাদী নেতারা আমাদের বলির পাঁঠা বানিয়ে দিলেন। অথচ একবারও গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করলেন না তারা কী চায়। তখন তো অন্য কোনও দলের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না।" শিরসি-তে সিআরপির মর্টারের গোলায় তিন গ্রামবাসী যুবকের প্রাণ যায়। সেখানে গ্রামবাসীরা বলেছেন : "যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিরোধে সামিল হতে বলতেন মাওবাদীরা।" আমাদের বলা হয়েছিল সিআরপি যাতে গ্রামে না ঢুকতে পারে তার জন্য জঙ্গলের মুখেই ওদের আটকে দিতে সবাই মিলে জড়ো হতে হবে। সেইমতো জড়ো হলেও সিআরপি থামেনি। গুলি চলেছে।" নানা জায়গায় নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের ঢাল হিসাবে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। বহু সময় মিছিল বা সমাবেশের পিছনে থাকত সশস্ত্র স্কোয়াড। যৌথবাহিনী ও সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলি-যুদ্ধের মধ্যে পড়ে আম-গ্রামবাসীদের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

শ্রেণী ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি

আদিবাসী-মূলবাসীদের এথ্‌নিক আইডেনটিটি, তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য-পরম্পরা-রীতিনীতি রক্ষা প্রধান, না তাঁদের ঘিরে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের কাজটি প্রধান? দুটির মধ্যে সংঘাত না সমন্বয়, কোন্‌টি বড়ো? সোভিয়েত বিপ্লবের সময় থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই নিয়ে টানাপোড়েন চলেছে। ইদানিং 'আইডেনটিটি পলিটিক্স'-এর আবেদন বিশ্ব জুড়েই বেড়েছে। এ নিয়ে তাত্ত্বিক চর্চা এবং প্রায়োগিক প্রশ্নে উতোরচাপানও উচ্চকিত। জঙ্গলমহল আন্দোলনেও তাকে ঘিরে প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। তবে মাওবাদীদের অন্দরমহলে বিতর্কের বিস্তৃতি বা গভীরতা সম্পর্কে বিশদে এখনও জানা যায়নি। তবে ঝাড়খন্ডি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মাওবাদীদের সখ্য ও বৈরিতার দুই পর্যায়েই ঘনিষ্ঠভাবে এই বিতর্ককে জানা-বোঝার চেষ্টা করেছেন, স্থানীয় এমন কিছু সাংবাদিক, গবেষক, সমাজকর্মী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকের থেকে সাধারণ ধারণা পেয়েছি। বাকিটা আন্দোলনের নেতা-কর্মীবৃন্দ এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহমর্মীদের থেকে জানার ইচ্ছে রইল।

পশ্চিম মেদিনীপুর-ঝাড়খন্ড সীমান্তে বাঁশপাহাড়ি, বেলপাহাড়ি, ভুলাভেদা, শিমূলপাল এলাকায় পূর্বতন এমসিসি এবং জনযুদ্ধ গোষ্ঠী ঝাড়খন্ডি গোষ্ঠীগুলির সহযোগিতায় কাজ শুরু করে আটের দশকের শেষ এবং নব্বইয়ের শুরুতে। এমসিসি-র সঙ্গে নানা ঝাড়খন্ডি গোষ্ঠী এবং সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠন মাঝি-মারোয়াদের সমন্বয়ে বহু গ্রামে সামাজিক সেবা ও উন্নয়নমূলক কমিটি গড়ে ওঠে। আবার কেন্দুপাতার সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি, মজুরিবৃদ্ধি, ভূমিপুত্রকন্যাদের অরণ্যের অধিকার, পুলিশি সন্ত্রাস ইত্যাদি নিয়ে যৌথ আন্দোলন সংগঠিত হয়। সিপিএম-কংগ্রেসের চোখে মাওবাদী-ঝাড়খন্ডি-মাঝি-মারোয়া সমার্থক হয়ে ওঠে। ধরপাকড়ের সময় পুলিশি খাতায় প্রায় সবাই মাওবাদী বলে চিহ্নিত হন। এরই ধারাবাহিকতায় অনেক ঝাড়খন্ডি ২০০৮ সালে জনসাধারণের কমিটিতে যোগ দেন।

কিন্তু নতুন শতকের প্রথম দশকের মধ্যপর্ব থেকেই টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছিল— ঝাড়খন্ডি-মাওবাদী সখ্যতায় এবং মাওবাদীদের অন্দরমহলে। যৌথ আন্দোলনের উদ্দেশ্য— লক্ষ্য, গতিপথ এবং তার অনুসারী সাংগঠনিক রীতিনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে। প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিকভাবে জনজাতি প্রধান বৃহত্তর ঝাড়খন্ড ক্ষেত্রের শরিক এই লালমাটির দেশ ও তার সন্তানেরা। তা সত্ত্বেও নতুন রাজ্য ঝাড়খন্ডের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় তিন জেলা— বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরকে যুক্ত করার দীর্ঘ দিনের দাবি বামফ্রন্টের আমলে জনজোয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে আইডেনটিটি-ভিত্তিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বশাসন, চাকরি-শিক্ষায় সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক রক্ষাকবচ ইত্যাদি দাবির প্রতি জঙ্গলমহলের জনমতের সমর্থন অন্তঃসলিলা ছিলই। একারণেই ঝাড়গ্রাম মহকুমার দুটি পঞ্চায়েত সমিতি এবং অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস-তৃণমূলের সহযোগিতায় ঝাড়খন্ডি গোষ্ঠীগুলির রমরমা এখনও। অরণ্যের অধিকার ও সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যুতে মাওবাদীরা এদেশের আদিবাসীদের স্বভাবমিত্র। স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গলমহলে মাওবাদী ও ঝাড়খন্ডি রাজনীতির সমাপতন একটা দূর পর্যন্ত অনিবার্য বা প্রত্যাশিত ছিল।

কিন্তু বিরোধ তৈরি হয় আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক রাজনীতি ও সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের বিপ্লবী তত্ত্ব মোতাবেক গেরিলা জোন নির্মাণের রাজনীতি এবং সাংগঠনিক

কার্যকলাপের মধ্যে। কারা বেশি আদিবাসী-মূলবাসীদের স্বার্থরক্ষক, কোন্‌টা বাইরে থেকে চাপানো রাজনীতি আর কোন্‌টা জঙ্গলমহলের সংগ্রামী ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উদ্ধার, তা নিয়ে সংঘাত বাড়ল।

পাশাপাশি ছিল আর একটি অনুচ্চারিত দ্বন্দ্বও। সেটি আন্দোলনে মূলবাসী কুর্মি-মাহাতো বনাম আদিবাসী সাঁওতালদের ভূমিকা নিয়ে। কুর্মি-মাহাতো সম্প্রদায় রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতাপূর্ব কাল থেকেই সক্রিয়, সঙ্ঘবদ্ধ এবং ঝাড়খন্ড আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সামাজিক ভিত্তি। ১৯৩৫ পর্যন্ত তাঁরা আদিবাসী জনগোষ্ঠী বলে স্বীকৃতি পেলেও নানা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কারণে তাঁরা স্বাধীন ভারতে সেই সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পাননি। ২০০৩-৪ পর্বে তাঁরা তপশিলি জনজাতির স্বীকৃতি ফের দাবি করেন। সাঁওতালদের কিছু সংগঠন তাতে খুশি হয়নি। তাঁদের থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী এই জনগোষ্ঠী সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা বেশি পাবেনই এই আশঙ্কায়।

এই গোষ্ঠী-বিরোধের কিছু ছাপ পড়ে মাওবাদীদের সংগঠনেও। এমসিসি ও জনযুদ্ধের মিলিত সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র পূর্বভারতীয় নেতৃত্বে আসার পর কিষেনজির সঙ্গে দ্বিজেন হেমব্রম, গুরুচরণ বাস্কে তথা মার্শাল ও জাগরী বাস্কেদের সঙ্গে টানাপোড়েনের কথা শোনা যায়। এর একটা ইস্যু ছিল সংগঠন ও স্কোয়াডের নেতৃত্বে আদিবাসীরা থাকবেন না মাহাতোরা। অন্য আর একটি ইস্যু ছিল, আদিবাসী সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রতি মাওবাদীদের মনোভঙ্গি ও সামাজিক সংগঠনগুলির মান্যতা। স্থানীয় বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনীতি ও সংগঠন করার পক্ষে ছিলেন একদা পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা কিষেনজি। জঙ্গলমহলে সন্তোষ রাণা এবং ঝাড়খন্ডি গোষ্ঠীগুলির আঞ্চলিক স্বশাসনের রাজনীতি তিনি নস্যাৎ করে দেন। আদিবাসীদের সামাজিক বা ধর্মীয় মোড়ল-মুরুব্বি-মাঝিদের কর্তৃত্ব মেনে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রতি সহনশীল মনোভাব নিয়ে চলায় তিনি রাজি ছিলেন না। অন্যদিকে, দ্বিজেন হেমব্রম, মার্শাল প্রমুখ অনেকে আদিবাসী সামাজিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি মেনে চলায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশের নেতাদের কথামতো কমিউনিস্ট গেরিলাদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ স্থানীয় আদিবাসী কর্মী-সমর্থক বা স্কোয়াড-সদস্যদের উপর চাপাতে চাননি।

মাওবাদীদের ভিতরে-বাইরের ঝাড়খন্ডি রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে এই টানাপোড়েনের নেপথ্যে কিষেনজির নিজস্ব বিশ্বাস, মূল্যবোধ নিশ্চয়ই ক্রিয়াশীল ছিল। তবে পর্যক্ষেকদের মতে, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব। সেটা হল জঙ্গলমহলের জনসংখ্যার কমবেশি ৩৩ শতাংশ আদিবাসীর তুলনায় ৪৬ শতাংশ কুর্মালিভাষী মূলবাসীর সংখ্যাধিক্য। ''উনি একবার বলেছিলেন, দল ও জনসাধারণের কমিটি সাঁওতালদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আমাদের জনভিত্তিও সীমিত হয়ে পড়বে'' —এক সাংবাদিক-গবেষকের মন্তব্য। ভিতরে-বাইরের মতবিরোধ বাড়ে ঝাড়খন্ডি নেতা-কর্মীদের একের পর খুনের ঘটনায়। দ্বিজেন-মার্শাল-জাগরীরা হয় 'বসে' যান নয় সাংগঠনিকভাবে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়। কিষেনজির অনুগামীদের মধ্যে অবশ্য আদিবাসী নেতা-কর্মীরাও ছিলেন। ২০০৮ সালে জনসাধারণের কমিটির গঠন পর্বে অন্যতম প্রধান অন্তরালের নেতা মনসারাম হেমব্রম বা সিংরাই টুডু বা সিদো সরেন ওরফে ভূতা বাস্কেরা তাঁদের প্রধান মুখ। ''দলিলপুর চকের সভায় আদিবাসীদের ভিড় দেখে আনন্দে সিংরাই কেঁদে ফেলেছিল। কারণ ওদের সংগঠনের ভিতরে তখন মাঝি মারোয়াদের নিয়ে টানাপোড়েন চলছে'' —এক প্রত্যক্ষদর্শী রাজনৈতিক কর্মীর মন্তব্য। প্রকাশ্যে কমিটির নেতাদের নাম ঘোষণায় আগে অন্তরালের বৈঠকও ছিল সিংরাইয়ের নেতৃত্বেই। অনুজ পান্ডের বাড়ি ভাঙ্গার দিনও তাঁর ভূমিকা আমরা পরে দেখেছি। সিদো ছিলেন কমিটির অন্যতম প্রধান নেতা এবং পরবর্তীকালে স্কোয়াড লিডার। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে জঙ্গলমহল আন্দোলনে মাওবাদীদের সংগঠন নিয়ে একটা কথা চালু হয়। ''আড়ালে নেতারা হয় তেলেগু নয় বাঙালি। সামনে মাহাতোরা, আর যোদ্ধারা সব সাঁওতাল।'' অতিরঞ্জিত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ থেকে উপরিল্লিখিত টানাপোড়েনের আঁচ মেলে।

নিশীথ মাহাতো ও জনজাগরণ মঞ্চ

কিন্তু মাহাতো সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা ঝাড়খন্ডি রাজনীতি-সংস্কৃতির মানুষজনকেও কি সঠিকভাবে দেখা হয়েছিল? এই প্রশ্নে সিপিএম বিরোধী ঝাড়খন্ডি গোষ্ঠীগুলির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘাত এবং পরবর্তীকালে খুনোখুনির ঘটনাগুলি বোঝার চেষ্টা করেছি। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলি তৃণমূলপন্থী জনজাগরণ মঞ্চের লোকজনের কথা। মঞ্চের অন্যতম সংগঠক নিশীথ মাহাতো ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আলোচনায় যে ছবিটা পেয়েছি, অবশ্যই সেটা একতরফা। জনসাধারণের কমিটি বা মাওবাদী নেতৃত্বের বক্তব্য জানতে পাইনি। কিন্তু আন্দোলন পর্বের নানা পর্যবেক্ষক এবং সমর্থক রাজনৈতিক কর্মীদের বয়ানে এটা স্পষ্ট যে জনজাগরণ মঞ্চের উত্থানের নেপথ্যে যৌথবাহিনী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা এবং নয়া শাসকদল তৃণমূলের ভূমিকা নির্ণায়ক হলেও মাওবাদী নেতৃত্বের অবিমৃষ্যকারিতার গুরুত্বও কম নয়। এর আগে ছত্তিশগড়ে সালওয়া জুডুমের নামে বিজেপি-কংগ্রেস সমর্থিত এবং কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের যৌথ মদতে গোন্ড জনজাতির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বাধানোর ঘটনা আমরা জানি। কিন্তু কে বালাগোপাল বা রামচন্দ্র গুহ প্রমুখ মানবাধিকার আন্দোলনের

প্রথমসারির ব্যক্তিত্বের কলমে আদিবাসীদের মধ্যে থেকে স্পেশাল পুলিশ অফিসার বাহিনী নিয়োগে সরকারের সাফল্যের পটভূমি নির্মাণে মাওবাদীদের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপের কাহিনী তুলনায় কম আলোচিত।

এই প্রেক্ষিতেই ২০১০ সালে ঝাড়গ্রাম মহকুমার জামবনি থানার কেন্দাংরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সৌমেন ভগতের হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য। গত বছর ডিসেম্বরে মহাশ্বেতা দেবী তরুণ সান্যাল প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের তরফে কলকাতা হাইকোর্টে যে হলফনামা পেশ করা হয়, তাতে সৌমেন ভগত এবং তাঁর সঙ্গী কমল মাহাতোকে খুনের জন্য মাওবাদীদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই নথি মোতাবেক, ২০১০ সালের ১১ জুলাই পঞ্চায়েতের উন্নয়ন সচিব কমল মাহাতোকে নিয়ে ফুলবেড়িয়া গ্রামে উন্নয়নের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন সৌমেনবাবু। স্থানীয় সুধীর মাহাতোর বাড়িতে একটি আলোচনাসভা চলাকালীন অজিত শিট, লক্ষীন্দর শিট প্রমুখের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র মাওবাদী বাড়িটি ঘিরে ধরে। সৌমেন ও কমল দুই জনকেই তারা নিকটবর্তী জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়। পরদিন জামবনি-বালিদিঘা রোডে কাপাসি ও শালবনি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁদের বুলেট বিদ্ধ দেহ মেলে। কিছু মাওবাদী পোস্টার এবং কার্তুজের খোলও উদ্ধার হয় ঘটনাস্থল থেকে। এই খুনের ঘটনায় ধৃত দশজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। পাঁচজনকে ফেরার ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারি নথিতে সৌমেনবাবুর রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে কোনও তথ্য না থাকলেও স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্রে জেনেছি, তিনি ছিলেন প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক বুদ্ধদেব ভগত এবং এলাকার দাপুটে সিপিএম নেতা বাসু (দেব) ভগতের ভাইপো। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে এসএফআই করতেন। জঙ্গলমহল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মতবিরোধের জেরে সিপিএম শিবির ছেড়ে জামবনি উন্নয়ন মঞ্চ বলে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যাতে ঝাড়খন্ডি ও অন্যান্য সিপিএম বিরোধীরা ছিলেন। সিপিএমের হাত থেকে কেন্দাংরি গ্রাম পঞ্চায়েত ছিনিয়ে নিয়ে নির্দল প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন। এলাকায় জনপ্রিয় এই তরুণ নেতা অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও একটি নকশালপন্থী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। মাওবাদী নেতৃত্বে জনসাধারণের কমিটি গড়ে উঠার প্রথম পর্যায়ে সম্পর্কটা তাঁদের মধ্যে বৈরিতার ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে বিরোধ বাধে। সৌমেনবাবু মাওবাদীদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে চাননি বা তাঁর এলাকায় মাওবাদী বা জনসাধারণের কমিটির নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে রাজি হননি। অন্য আর একটি ব্যাখ্যাও শুনেছি। সেটি হল পঞ্চায়েতের তহবিল সংক্রান্ত বিরোধ। জনসাধারণের কমিটির তৎকালীন সভাপতি উমাকান্ত মাহাতো এবং তাঁর সঙ্গীদের দাবি মতো অর্থ দিতে তিনি অস্বীকার করেন। তারই জেরে এই হত্যাকাণ্ড বলে অনেকের ধারণা। উমাকান্ত জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত হওয়ার পর পুলিশের সঙ্গে 'সংঘর্ষে' নিহত হন। ফলে সৌমেন-হত্যার প্রকৃত রহস্য এখনও উন্মোচিত হয়নি।

নিশীথ মাহাতো সৌমেনবাবুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জামবনির দক্ষিণ বালিদিঘির বাসিন্দা এবং ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের ইতিহাসের স্নাতক তরুণটির বক্তব্য: সৌমেন ভগতের হত্যাকাণ্ডই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নিজের পরিবারের ঝাড়খন্ডি পরিচয় স্বীকার করলেও রাজনীতিতে প্রথমে কলেজে এসএফআই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং পরে জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে যোগাযোগের প্রসঙ্গ তিনি এড়িয়ে যান। তাঁর কথায়, একটি সম্পন্ন ও প্রভাবশালী সিপিএম নেতাদের পরিবারের ছেলে সোমেনবাবু তিরিশ বছর সিপিএমের দখলে থাকা পঞ্চায়েতে প্রধান হিসেবে জিতে এলাকায় একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠছিলেন। সে সময় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয় কিছু সিপিএম নেতা-কর্মী জনসাধারণের কমিটিতে ভেড়েন। এদের মদতে মাওবাদীরা সৌমেনবাবুকে খুন করে, কারণ তিনি তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাড়িয়েছিলেন। নিশীথের বক্তব্য: ''এই খুনের সিদ্ধান্ত মাওবাদীদের কোন্ স্তরে হয়েছিল জানি না। আসলে সশস্ত্র স্কোয়াডের উপর মাওবাদী নেতাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বিশেষ করে গণ-মিলিশিয়া গড়ার পর তো খুনের হিড়িক তুঙ্গে উঠল। সোমেন হত্যার পরই আমরা বুঝতে পারি, পাল্টা রুখে না দাঁড়ালে আমাদেরও ওরা মেরে দেবে। অথচ নানা অত্যাচার, তোলাবাজি, মারধোর, রাতভর মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছিল।''

নিশীথের কথায়, এই ক্ষোভকে পুঁজি করেই প্রশাসন এবং কংগ্রেস ও তৃণমূলের মদতে সৌমেন ভগত হত্যার বর্ষপূর্তিতে তাঁর গ্রামে স্মরণসভায় ২০১১ সালে ১২ জুলাই জনজাগরণ মঞ্চের জন্ম। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল ও কংগ্রেস নেতারা। যেমন, কেশপুরখ্যাত তৃণমূল ও পরে কংগ্রেস নেতা মহম্মদ রফিক। সেদিনই ঝাড়গ্রামে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সভা। মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনার উদ্যোগের কোনও উল্লেখ তিনি করেননি। বরং জঙ্গলমহলের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেদিন তিনি হিংসা ত্যাগের পাশাপাশি আদিবাসী-মূলবাসী যুবকদের 'দেশের জন্য সরকারের জন্য বন্দুক' ধরার আহ্বান জানাচ্ছেন। ঘোষণা করছেন জঙ্গলমহলে স্পেশাল পুলিশ কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা। যা মাওবাদীরা তো বটেই মানবাধিকার আন্দোলন ও নাগরিক সমাজের একটি বড় অংশের কাছেই ছত্তিশগড়ের সালওয়া জুড়ুম মডেলের কার্বন কপি বলেই প্রতিভাত হবে। ''এমনকি সালওয়া জুড়ুমও শুরু হয় জনজাগরণ মঞ্চের নামে'' —মনে করিয়ে দিলেন সঙ্গী

অধ্যাপিকা নন্দিনী সুন্দর, যিনি ছত্তিশগড়ে সরেজমিন তদন্তে সামিল হয়েছেন বারংবার। তাঁর এবং রামচন্দ্র গুহ সহ অন্যান্য সমাজকর্মীদের জনস্বার্থমূলক আবেদনের প্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্ট সালওয়া জুড়ুম অভিযান তথা স্পেশাল পুলিশ অফিসার বা এসপিও নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করেছে।

নিশীথের কাছেই জনজাগরণ মঞ্চের মাওবাদী-বিরোধী অভিযানের কিছু কথা শোনা গেল। স্পষ্টতই মাওবাদী দমনে তাঁর ও মঞ্চের ভূমিকা নিয়ে তিনি প্রবল গর্বিত। যদিও চেহারায় অতীব সাধারণ এক যুবক৷ কিন্তু সঙ্গীদের সতর্ক প্রহরা এবং সম্ভ্রমের ঘেরাটোপে তাঁর নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে শ্লাঘাবোধ উচ্চকিত। ''সরকার তো প্রথমদিকে মাওবাদীদের মহড়া নিতে ময়দানে নামতে চাইছিল না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। কিন্তু আমরাই চাপ দিয়ে নামালাম। তার আগে একের পর এক অভিযানে দেখিয়ে দিলাম মাওবাদীদের অস্ত্রেই ওঁদের ঘায়েল করা যায়।''

তাঁর ব্যাখ্যায়, ''মাওবাদীরা জনসাধারণের কমিটিতে কোন দলের ঝান্ডা আনতে দিত না। নিজেরা আড়াল থেকে সব কলকাঠি নাড়লেও কমিটি প্রকাশ্যে ছিল দলনিরপেক্ষ গণসংগঠন। আমরাও মঞ্চকে ওই ধাঁচে সাজালাম। ওরা গ্রামের পর গ্রাম বাইরে থেকে মিছিল এনে দখল করত। পিছনে থাকত স্কোয়াড। আমরা শুরুর দিকে একাই ঢুকছিলাম। কিন্তু মাসানভি-তে ওরা গুলি চালাল। আমরা গুলি খেয়ে গেলাম। এরপর থেকে আমরা যৌথবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে এগোতাম। জনসাধারণের কমিটির যারা মাওবাদীদের সঙ্গ ছাড়তে চায়, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিকল্পনা করতাম। যৌথবাহিনী গ্রামে ঢুকে এলাকায় ধারে কাছে মাওবাদী স্কোয়াডের আনাগোনা আছে কিনা খোঁজ নিত। জঙ্গল-লাগোয়া এলাকায় পাহারা দিত। তারপর আমরা মিছিল নিয়ে ঢুকেছি গ্রামে। যৌথবাহিনীর সঙ্গে ওয়ারলেস বা অন্য উপায়ে ঘনঘন যোগাযোগ হত।''

যৌথবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা অকপটে বললেও সতর্ক নিশীথ ও তাঁর সঙ্গীরা সেই সূত্রে অস্ত্র পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। সশস্ত্র বাইকবাহিনী দিয়ে ঘিরে জনসাধারণের কমিটির কর্মী-সমর্থকদের অস্ত্র ও হুমকির মুখে তৃণমূলে নাম লেখানোয় বাধ্য করার অভিযোগও মানেন নি। মাওবাদীরা তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নিশীথ ও ফুল্লাই সোরেনের নেতৃত্বে ভৈরব বাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। শান্তি-উদ্যোগের পর্বে মধ্যস্থদের কাছে দলের রাজ্য সম্পাদক আকাশের চিঠিতে এই অভিযোগ সম্পর্কে নিশীথ অবহিত এবং সেটা যে তিনি উপভোগ করেছেন তা তাঁর শরীরী ভাষায় স্পষ্ট। ''শুভেন্দুদা আমাদের পাশে আছেন'' —নিশীথের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। এই ফুল্লাই একসময় ঝাড়গ্রামের কাছে সাপধরা অঞ্চলে জনসাধারণের কমিটিতে ছিলেন বলে স্থানীয় পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন। এখন মঞ্চ সরাসরি তৃণমূলের শাখা সংগঠন, সেটাও জানালেন নিশীথ। তৃণমূলের সভার অন্যতম আহ্বায়কও তিনিই। বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল-মাওবাদী সম্পর্কের কথা দুদলের নেতারাই এখন অস্বীকার করছেন। কিন্তু নিশীথের বক্তব্য : ''দিদির মিটিংয়ে লোক জোগাতো মাওবাদীরাই। ভোটের আগে আমাদের কী ক্ষমতা ছিল? দিদির জমি ওরাই তৈরি করেছে। তৃণমূলকে ভোট দিতে প্রচার করেছে। কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি ওদের দাদাগিরির বদলে লোকে এখন দিদিকে চাইছে।'' কিন্তু লোকে যে বলছে সিপিএম ও মাওবাদীদের পর এখন তৃণমূলের দাদাগিরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ''তেমন হলে আমরা প্রতিবাদ করব'' —নিশীথের দাবি। তবে শুভেন্দু স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, ''হার্মাদ এবং মাওবাদীদের জঙ্গলমহলে ফের হিংসার রাজনীতি করতে'' দেবেন না তারা। ''ওদের কাছ থেকে গণতন্ত্রের কথা শুনতে চাই না।'' নিশীথ ও সঙ্গীদের নিয়ে বাইকবাহিনী রাস্তা দাপিয়ে গ্রামের পথে ঢুকে যাওয়ার দৃশ্য দেখে এই কথার মর্মার্থ বোঝা গেল।

মাওবাদী গণতন্ত্র ও খতমের রাজনীতি

লালগড় আন্দোলনের প্রথম পর্বে জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে যুক্ত বা সহযোগী বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠী এবং ঝাড়খন্ডি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরবর্তী সময়ে মাওবাদীদের শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুপক্ষের খুনোখুনিতে পরিস্থিতি বিষিয়ে ওঠে। পাশাপাশি সিপিএম নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণ ও হত্যার ঘটনায় জঙ্গলমহল ২০০৯-১১ পর্বে বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। স্রেফ পুলিশের চর সন্দেহে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে। সিপিএম সমর্থক সালকু সোরেনের মৃতদেহ দাহ করতে না দিয়ে দিনের পর দিন ফেলে রাখার মতো চূড়ান্ত নৃশংস এবং অমানবিক ঘটনাও ঘটেছে। সিপিআই-মাওবাদী নেতৃত্ব, বিশেষত গণপতি, আজাদ ও কিষেনজি নানা সাক্ষাৎকারে খুনোখুনি শুরুর দায় সিপিএম ও অন্যান্য বিরোধীদের উপরই দায় চাপিয়েছেন। এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুনিধন এবং গুপ্তচর হত্যার অনিবার্যতা ও ন্যায্যতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গে আসার আগে একদা বন্ধু ও সহযোগীদের সঙ্গে তাঁদের বৈরিতার উৎস সম্পর্কে জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীদের কথা শুনে নিই।

ঝাড়খন্ড সমন্বয় মঞ্চে সামিল ঝাড়খণ্ড অনুশীলন পার্টি এবং সন্তোষ রাণা ও ভাস্কর নন্দীর নেতৃত্বাধীন পিসিসি-সিপিআইএমএল-এর মতো গোষ্ঠীগুলির অভিযোগ : লালগড় আন্দোলনের গোড়ার পর্বে অন্যান্য সিপিএম বিরোধী শক্তির মতোই তাঁরা জনসাধারণের কমিটিতে যোগ দেন বা সহযোগী ভূমিকা নেন। কিন্তু মাওবাদীরা অপরাপর রাজনৈতিক শক্তিগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব মানতে রাজি হননি এবং তাঁদের উপর

নিজেদের মত-পথ চাপিয়ে দেন। পরিণামে তাঁরা সরে এসে ভিন্ন মঞ্চ গড়ে সমান্তরাল রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে গেলেই মারধোর, অত্যাচার, অফিস দখল এবং শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি শুরু হয়।

ঝাড়খন্ড অনুশীলন দলের নেতা মনোরঞ্জন মাহাতো ও তাঁর সহযোগীদের বক্তব্য: সুধীর মান্ডি থেকে বাবু বসুর মতো জনপ্রিয় ঝাড়খন্ডি নেতাদের হত্যা করেছে মাওবাদীরা রাজনৈতিক বিরোধীদের নিকেশ করার লক্ষ্যেই। শুধু তাঁরাই নয়, মাঝি-মারোয়ার মতো সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠনের নেতাদেরও খুন করা হয়েছে জঙ্গলমহলে মাওবাদী নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ করার তাগিদেই।

লালগড় বাজার লাগোয়া সিজুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এমনই এক ঝাড়খন্ডি সমর্থকদের ভিড়ে কথা বলতে গিয়ে জানলাম : ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের সময় সিপিএমের সঙ্গে সংঘাতের জেরে তাঁদের ৩৭ জন জেলবন্দি হন। পুলিশ-প্রশাসন সিপিএমের বশংবদ। গোটা ঝাড়খন্ড মহকুমাতেই তৃণমূলের অস্তিত্ব কার্যত শূন্য ছিল। কংগ্রেস টিমটিমে। এই অবস্থায় ঝাড়খন্ড পার্টির নরেন হাঁসদা ও আদিত্য কিস্কু গোষ্ঠী সহ নানা উপদলে বিভক্ত ঝাড়খন্ডিদের সঙ্গে মাওবাদীদের সম্পর্ক ছিল মোটের ওপর বন্ধুত্বপূর্ণ। লালগড় আন্দোলনপর্বে জনসাধারণের কমিটিতে এরা অধিকাংশই যোগ দেবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে মাওবাদী নেতৃত্বের একতরফা সিদ্ধান্তে এবং তাদের প্রশ্রয়ভাজন কমিটির ভুঁইফোঁড় নেতাদের অত্যাচার-অবিচারে, অভিযোগ এমনই। ''প্রথমে ওরা সিপিএমের রহিত রায়, কার্তিক সিংয়ের মতো কয়েকজনকে মারল। তারপর রমেশ সরেন, নারায়ণ সরেন, মানিক মুর্মু, অরুণ প্রতিহারের মতো ঝাড়খন্ডিদের। তারপর তো শুধু খুনের মিছিল। যদুপতি প্রতিহারের মতো স্কুল শিক্ষক থেকে বরুণ প্রতিহারের মতো চায়ের দোকানি— সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন মাওবাদীদের হাতে। কোনও গণআদালতে বিচারেরও বালাই ছিল না। পুলিশের চর বলে সন্দেহ হলেই লাশ নামিয়ে দিয়েছে''— মন্তব্য স্থানীয় ঝাড়খন্ডি সমর্থকদের। তবে ভিড়ের মধ্যেই কেউ কেউ বলেছেন : প্রথমদিকে মাওবাদীরা এলাকার অত্যাচারী বলে কুখ্যাতদের মৃত্যুদণ্ড দিলেও পরে মুড়ি-মিছরি একাকার হয়ে যায়। কথায় কথায় কমিটির বিরোধী বা একদা সমর্থকদের মারধোর, জরিমানা, বয়কট ঘটেছে। বেলপাহাড়ির কংগ্রেস নেতা সুব্রত ভট্টাচার্য মাওবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাঁর মাধ্যমেই বেশ কিছু স্কোয়াড সদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর কথায়, কিষেনজি তাঁকে বলেছিলেন: ''ধানে পোকা লাগলে চাষিরা যেমন কীটনাশক ছড়ান তেমনই সমাজদেহে কীটসংক্রমণ ঠেকাতেই খুন।'' জবাবে ভট্টাচার্যের মন্তব্য: ''নির্বিচারে কীটনাশক ছড়ানোয় ফসলই নষ্ট হয়ে গেল।''

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ঝাড়খন্ডি সমর্থকদের অনেকে আজ যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের বিপক্ষে। ''যৌথবাহিনী আছে বলেই সাহস করে বলতে পারছি। সিপিএম হার্মাদ বা তৃণমূলী ভৈরব বাহিনীর অত্যাচার মনে রেখেও বলছি, মাওবাদীদের সন্ত্রাস সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাহিনী গেলেই ওরা ফিরে এসে একই অবস্থা তৈরি করবে'' —ঝাড়খন্ডি আশিস কুন্ডুর বক্তব্য। বাকি সকলে অবশ্য তাঁর অবস্থানের পক্ষে মুখ খোলেননি। তবে যৌথবাহিনীর স্থানীয় শিবির থেকে কম্বল, শাড়ি, ক্রিকেট বা ফুটবলের সরঞ্জাম বিলি বাহিনীর অত্যাচারের স্মৃতি ফিকে করে দিয়েছে বলে কবুল করলেন। সন্তোষ রাণার বক্তব্য: এই পরিস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক ও অনভিপ্রেত হলেও জঙ্গলমহলের আজকের বাস্তবতাকে অনেকটাই প্রতিফলিত করে।

মাওবাদী নেতৃত্ব অবশ্য এতাবৎ এইসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। সন্তোষ রাণাদের সঙ্গে তাঁদের পত্রযুদ্ধে তাঁরা ঝাড়খন্ডি নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা, সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জনসাধারণের কমিটির নেতা-কর্মীদের হত্যার পাল্টা অভিযোগ করেছেন। মাওবাদ দল ও মমতা সরকারের মধ্যে শান্তি-উদ্যোগ পর্বে প্রাক্তন সিপিএম কর্মী ও ঝাড়খন্ডি নেতা বাবু বসু ও তৃণমূল নেতা লালমোহন মাহাতো হত্যাকে ন্যায্য বলেই প্রতিপন্ন করেছেন আকাশ। বিরোধী রাজনীতির লোকেদের স্বাধীন রাজনীতিতে বাধার অভিযোগ অস্বীকার ক'রে তাঁর বক্তব্য : এরা সব তৃণমূলের ভৈরব বাহিনীর নেতা-সংগঠক ও যৌথবাহিনীর দালাল। এর আগে সিপিএম নেতাদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে হার্মাদ বাহিনীর সংগঠক হওয়ায় অপরাধে। এই প্রসঙ্গে কিষেনজির সঙ্গে এক টেলিফোন-সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি বলেছিলেন, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন মেনেই জনগণের শত্রুদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এটা তাঁর একার সিদ্ধান্ত নয়। তাঁর মন্তব্য ছিল : ''যতজনকে মারা উচিত তাঁর পঞ্চাশ শতাংশকেও আমরা মারিনি। কয়েকটি গণ-আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলেও বিকাশের মতো নেতারা স্থানীয় মানুষকে বুঝিয়ে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করেছে। বাইরে লোকে যাই ভাবুক, দলের ভিতরে আমাকে সবাই নরম প্রকৃতির (সফট্ মাইন্ডেড) লোক বলেই জানে।'' মাওবাদীদের হাতে নিহতদের মধ্যে শ্রেণীচরিত্র বিচারে বহু গরীব আদিবাসী-মূলবাসী মানুষ রয়েছেন, এই যুক্তিতে তাঁদের হত্যার বিরোধিতাকে তিনি আমল দেননি। শ্রেণী উৎস যাই হোক, তারা রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী জনগণের শত্রুতায় অবতীর্ণ। তাই মৃত্যুদণ্ডই তাঁদের পাওনা— এই ছিল তাঁর পাল্টা যুক্তি। দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত (পরে র‍্যাডিক্যাল নোট্‌স.কম ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে অনূদিত) তাঁর লেখায় কিষেনজি 'ইনফর্মার' এবং 'ফ্যাসিস্ট'

নেতাদের হত্যার সপক্ষে যা বলেছেন তার মর্মার্থ: তাঁরা সাধারণভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে থাকলেও যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তাঁদের অবস্থান আলাদা। এহেন পরিস্থিতিতে ন্যায়ের নীতি ও মাপকাঠি ভিন্নতর। শুধু তাই নয়, গৃহযুদ্ধের সময় চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা, উদ্যোগ ও সৃজনশীলতার ভূমিকা সীমিত। মানবাধিকার আন্দোলনকে এটা মেনে নিয়ে 'প্রতিরোধরত যোদ্ধা জনতার' পাশে দাঁড়াতে বলেছেন তিনি। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পক্ষে চিদাম্বরমের কণ্ঠে প্রায় একই যুক্তি কি শুনি নি? আজাদ, গণপতির নানা সাক্ষাৎকারে এই যুক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনেছি।

সহমর্মীদের সমালোচনা

কিন্তু জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষ, জনসাধারণের কমিটির সমর্থকরা যে এই যুক্তি, বলা ভালো কুযুক্তি, মেনে নেননি সেকথা অতীব মতান্ধ ব্যতিরেকে সকলেই মেনে নেবেন। এমনকি মাওবাদীদের প্রতি ঘোর সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী-অ্যাকটিভিস্টরাও অনেকে রাজনৈতিক বিরোধী এবং সন্দেহভাজন পুলিশ-চরদের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে গৌতম নভলাখার সাম্প্রতিক একটি লেখার উল্লেখ করেছি। *ওয়ার অ্যান্ড পিস ইন জঙ্গলমহল—পিপল, স্টেট অ্যান্ড মাওয়িস্টস* শীর্ষক সংকলন গ্রন্থে (সেতু প্রকাশনী, কলকাতা) নভলাখা তাঁর নিবন্ধে জনসাধারণের কমিটির উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও পুলিশের চর সন্দেহে খুনকে মাওবাদীদের অন্যতম দুই আহাম্মকি (Blunder) বলে সমালোচনা করেছেন। যৌথবাহিনী, সিপিএম, তৃণমূল সহ অন্যান্য দলগুলির দ্বারা হত্যাকাণ্ডের নজিরগুলিকে নজর-আড়াল না করার কথা বলেও তিনি মনে করেন : "যুদ্ধে বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবিপ্লবীদেব মতো হতে পারে না। বিপ্লবীদের গৃহীত যুদ্ধের নিয়ম-নীতি জনমানসে তাঁদের রাজনীতির আবেদন বাড়ানো এবং জনগণের মধ্যে বন্ধু ও মিত্র-স্থানীয়দের কাছে টানার লক্ষ্যে নিয়োজিত।" দণ্ডকারণ্যের মতো জঙ্গলমহলে 'জনগণের জেল' এর ব্যবস্থা না থাকায় 'ইনফর্মার' খুনের ঘটনা বেড়েছে, সুজাত ভদ্রের সঙ্গে বিতর্কে কিষেনজির এ হেন যুক্তিকে নভলাখাও আমল দেননি। তাঁর বক্তব্য: জঙ্গলমহল আর দণ্ডকারণ্য, এলাকার আয়তন এবং মাওবাদী নিয়ন্ত্রণ, দুদিক থেকেই তুলনীয় নয়। 'ইনফর্মার'-এর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পিছনে মাওবাদীদের দ্বারা সিপিএম সমর্থক-কর্মীদের প্রতি দলত্যাগের হুকুমজারি এবং অন্যথায় সামাজিক বয়কট এমনকি খুনের হুমকির ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট। সিপিএম এবং যৌথবাহিনী এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে জনসাধারণের কমিটিতে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে নেয়। "আমার বিশ্বাস, ইনফর্মারের সংখ্যা বাড়ার পেছনে এর ভূমিকা ছিল।"

সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারের বদলে এই নির্বিচার হত্যালীলায় মাওবাদীদের আদর্শগত আবেদন কমে যায়, নভলাখার এই মূল্যায়নের সঙ্গে আমি একমত। এই প্রেক্ষিতেই জঙ্গলমহলের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রশ্নে নাগরিক সমাজের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর্বটিকে বিচার করা জরুরি বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে নভলাখার মন্তব্য : "দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষজনের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের ন্যায্যতা এবং রাজনীতিগত গুরুত্বের পক্ষে সোচ্চার সমর্থকরাও আছেন। কিন্তু তাঁরা রাজনৈতিক বিরোধিতার মীমাংসায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বা অন্যবিধ শক্তিপ্রয়োগ মেনে নিতে রাজি নন।" এই ধরনের হত্যাকাণ্ডগুলি পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রমনস্ক সাধারণ মানুষ ও নাগরিক সমাজের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে একথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন: "প্রশ্নটা রাজনৈতিক নৈতিকতার (ethics)। সাধারণ খুনি, ধর্ষক, তোলাবাজদের অপরাধের সঙ্গে মাওবাদীদের দ্বারা খুনের ঘটনার পার্থক্য টানতে হলে বিপ্লবীদের শুধুমাত্র নিজেদের নেতা-কর্মীদের কাছে দায়বদ্ধ হলেই হবে না। যাদের তাঁরা কাছে টানতে চান তাদের কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। বিশেষ করে যখন বহু খুনের ঘটনাই বিপ্লবী রাজনীতি ও আদর্শের বিরোধী।" এই প্রসঙ্গে তিনি বিনপুর ২ নম্বর অঞ্চল পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান ও ঝাড়খন্ডি নেতা সুধীর মান্ডির হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করেছেন। জীবিত থাকাকালীন কিষেনজি বা তার ডেপুটিরা এখনও এহেন হত্যাকাণ্ডগুলি নিয়ে ভুল স্বীকার করেননি।

মাওবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব খুনোখুনির বাড়াবাড়ির সমালোচনা করছেন, এমন খবর মাঝেমধ্যে শোনা গেছে। পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। কিন্তু কিষেনজিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তা নস্যাৎ করে দেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন : "আমি জঙ্গলমহলে যা করেছি তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিয়েই। এখানে কিষেনজির লাইন বলে আলাদা কিছু নেই। আপনারা চাইলে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জানতে চাইতে পারেন।" গণপতি ও আজাদের বক্তব্য যদি সামগ্রিকভাবে মাওবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বক্তব্য হয় তাহলে কিষেনজির দাবি মিথ্যে নয়। দলের শীর্ষস্তরে প্রাক্তন এমসিসি নেতাদের ভিন্নমতের কথা কানাঘুষোয় শোনা গেলেও এখন পর্যন্ত তার কোনও স্পষ্ট ছবি বা প্রামাণ্য নথিপত্র প্রকাশ্যে আসেনি। এই অবস্থায় জঙ্গলমহলে বিরোধী নির্বিশেষে কোতল অভিযান এবং জনসাধারণের কমিটির ভিতরে-বাইরে ভিন্নমতের অধিকারের অস্বীকৃতির দায় ও তার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক পরিণাম বিশ্লেষণে গোটা দলকেই দায়ী করতে হবে। বস্তুত, জঙ্গলমহল আন্দোলন ঘিরে মাওবাদী কার্যকলাপকে দলের সামগ্রিক রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-সামরিক নীল নক্সা এবং তার প্রয়োগের ইতিহাস থেকে আলাদা করা যাবে না।

সেই প্রেক্ষিতে দলের সূতিকাগার অন্ধ্রে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর

কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রয়াত কে বালাগোপালের তীব্র সমালোচনা জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। ২০০৪ সালে অন্ধ্রে রাজশেখর রেড্ডি সরকারের সঙ্গে জনযুদ্ধ ও অন্যান্য দুএকটি নকশালপন্থী গোষ্ঠীর শান্তি আলোচনা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বালাগোপাল (*ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ২৬ মার্চ, ২০০৫, *ওয়ার অ্যান্ড পিস* সংকলনে পুনর্মুদ্রিত) গণতান্ত্রিক অধিকার হননের দায়ে সরকার, পুলিশের সঙ্গে মাওবাদীদের প্রবল সমালোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: শাসকদল ও পুলিশ সব ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পিছনে মাওবাদী ভূত দেখবে এবং মিটিং-মিছিল-সমাবেশের আইনি অধিকার কেড়ে নেবে। মাওবাদীদের দমনের নামে ভূয়ো সংঘর্ষ শয়ে শয়ে তরুণের প্রাণ কেড়ে নেবে। জেলে পচিয়ে মারবে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার বালাগোপাল একই সঙ্গে মাওবাদীদের খাস তালুকগুলিকে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপে নিষেধাজ্ঞা বা তাঁদের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের খুনকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেননি। সংসদীয় দলগুলি, কংগ্রেস, বিজেপি বা তেলেগু দেশম জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে এবং জনস্বার্থবিরোধী কাজ করে— এই যুক্তিতে তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে বা নির্বাচনী প্রচারে বিপ্লবী নিষেধাজ্ঞা চলতে পারে না। কেন না, বালাগোপালের দর্শন-ঋদ্ধ মন্তব্য, "truth can be realised only in freedom", একমাত্র স্বাধীন মতপ্রকাশ ও ভিন্নমত শোনা-জানার মাধ্যমেই আমজনতা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সত্য অনুধাবন করবেন। বিপ্লবীদের তাতে বাধা দেওয়া চলবে না। অবশ্যই তাঁরা সংসদীয় দলগুলির ভণ্ডামি ও বিশ্বাসঘাতকতাকে উন্মোচিত করবেন। একই সঙ্গে তাঁদেরও সমালোচনা শোনা ও ভুল স্বীকারের মানসিকতা রাখতে হবে। ইতিহাসের রথের সারথি হওয়ার দাবি তুলে প্রকৃত সত্যের ধ্বজাধারী রূপে একমেবাদ্বিতীয়ম ভূমিকায় নামা চলবে না।

শুধু রাজনৈতিক বিরোধীদের নিকেশ বন্ধ নয়, বালাগোপাল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-জ্ঞানে বা ভুয়ো সংঘর্ষে বিপ্লবীদের হত্যার বদলায় যে কোনও পুলিশকর্মী খুনেরও নিন্দা করেছেন। শাসকদল বা পুলিশের দালাল সন্দেহে খতমের প্রবণতার সমালোচনায় তাঁর বক্তব্য: শাস্তি দেওয়ার আগে অভিযুক্ত সম্পর্কে অভিযোগগুলিতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে, তার জনবিরোধী কার্যকলাপের প্রমাণ দিতে হবে। একই সঙ্গে অভিযুক্তের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিও বিচার্য। "বস্তুত, এটাই হল আমজনতার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি" — বালাগোপালের মন্তব্য।

সন্দেহ নেই জঙ্গলমহলের মানুষ বা লালগড় আন্দোলনের গোড়ার পর্বে সহমর্মী নাগরিক সমাজের অংশীদারদেরও দাবি ছিল এটাই। উত্তর তেলেঙ্গানার শক্ত ঘাঁটি থেকে কার্যত উৎখাত হওয়ার পর তৎকালীন জনযুদ্ধ নেতৃত্ব প্রভূত শিক্ষাগ্রহণের অঙ্গীকার করেছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও এসময় নানা প্রশ্নে সমালোচনায় মুখর হন। কিন্তু জঙ্গলমহলে সে শিক্ষা যে কাজে লাগানো হয়নি তা বিগত কয়েক বছরের ঘটনাপ্রবাহেই প্রমাণিত।

তৃণমূলকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন

অন্ধ্রের আরও কিছু শিক্ষা জঙ্গলমহলে ভুলে গিয়েছিলেন মাওবাদী নেতৃত্ব। তাঁদের সহমর্মীদের অনেকের মতে, এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটি হল বিগত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে আড়াল-আবডালে সমর্থন। গৌতম নভলাখার মতো অনেকেই এই মতের সমর্থক। ভোটের মাসকয়েক আগে কিষেনজি মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান বলে আনন্দবাজারে প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকারটিকে সিপিএম মমতা-মাওবাদী গাঁটছড়ার অকাট্য প্রমাণরূপে প্রচার করে। এতে জঙ্গলমহলে জনসাধারণের কমিটির সমর্থকরা ধন্দে পড়েন। সম্প্রতি ভারভারা রাও ও অন্যান্যরা কিষেনজির মমতা-সম্পর্কিত মোহের কথা অস্বীকার করে বলেছেন, তাঁর কথাকে বিকৃত করা হয়েছিল আনন্দবাজারে (সূত্র : *ওয়ার অ্যান্ড পিস ইন জঙ্গলমহল*)। কিন্তু নভলাখার মন্তব্য : দলীয়ভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কোনও প্রতিবাদপত্র (denial) না জারি ক'রে মাওবাদী নেতারা তৃণমূলের প্রতি তাঁদের সমর্থন-সম্পর্কিত প্রচারটিরই পালে হাওয়া তুলে দেন। বিভ্রান্তি ছড়ায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যে শুধু নয়, দলের মধ্যেও। তারই চূড়ান্ত নজির জনসাধারণের কমিটির মুখপাত্র ও স্বীকৃত নেতা জেলবন্দী ছত্রধর মাহাতোর নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত ঘিরে দলের মধ্যে মতভেদ ও কমিটিতে সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তির ঘটনায়।

২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্-মুহূর্তে শুধু নয়, 'সামাজিক ফ্যাসিবাদী' সিপিএম-বিতাড়নের লক্ষ্যে মমতার দলের সঙ্গে নানাস্তরে বোঝাপড়া-গাঁটছড়ার শুরু কিষেনজির নেতৃত্বে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর জমানায়। গড়বেতা-চন্দ্রকোণা-গোঘাট-কোতলপুর অঞ্চলে কেশপুর পর্বে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএমের সঙ্গেও স্থানীয়ভাবে হাত মেলান কিষেনজি। নন্দীগ্রাম পর্বে "শত্রুর শত্রু আমার মিত্র" এই নীতি মেনে মমতাও এরপর মাওবাদীদের কাছে আসেন। সেসময় জঙ্গলমহলে সংগঠনহীন তৃণমূল নেত্রী কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে সিপিএমের বিরুদ্ধে মাওবাদীদের ব্যবহার করেছেন। এর চরম উদাহরণ, ২০১০ সালের ৯ আগষ্ট লালগড়ে সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশ। মেধা পাটকার, স্বামী অগ্নিবেশ, মহাশ্বেতা দেবী, বিভাস চক্রবর্তী, সুজাত ভদ্রদের সামিল করে সেই সভায় আজাদ-হত্যার নিন্দায় মুখর মমতা মাওবাদীদের সঙ্গে সিপিএম-বিরোধী নাগরিক সমাজের মনও জিতে নেন। কিন্তু জমায়েতের পিছনে জনসাধারণের কমিটি তথা মাওবাদীদের উদ্যোগ

থাকলেও তাঁদের কাউকে তিনি মঞ্চে উঠতে দেননি। অন্ধ্রের পথ অনুসরণ করেই মাওবাদী নেতৃত্ব তখন বাম-জমানার অবসান ও মমতার উত্থানে সাহায্যের বিনিময়ে জঙ্গলমহলে গেরিলা জোন নির্মাণ ও দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের স্বপ্ন দেখছিলেন। গদি-দখলের পর চন্দ্রবাবু নাইডু এবং রাজশেখর রেড্ডিদের ভোলবদল এবং পরবর্তীকালে তাঁদের জমানায় মাওবাদী নিধনপর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়েছিলেন তাঁরা।

সম্ভাবনার গর্ভপাত

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়তো ঠেকানো যেত। যদি শান্তি আলোচনার উদ্যোগ-পর্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাওবাদী নেতৃত্ব নতুন পথে হাঁটার মানসিকতা দেখাতেন। সারা পৃথিবী জুড়েই আজ প্রমাণিত যে নির্বাচিত সরকার বা শাসকদলের বাইরে, এমনকি সংসদীয় বিরোধী দলগুলির বাইরেও আমজনতার অজস্র কণ্ঠস্বর নানা পার্টি-বহির্ভূত গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা এবং মানসিকতায় এটা ধরাই পড়েনি যে জনস্বার্থ রক্ষার বা জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল বা গোষ্ঠীগুলির একচেটিয়া নয়। তা হলে নির্বাচনী রাজনীতির স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ত না। অকুপাই ওয়াল স্ট্রীটের মতো পার্টি-নিয়ন্ত্রণহীন আন্দোলনের জন্ম হত না। অন্যদিকে মাওবাদীরা বুঝতে রাজি নন যে সোভিয়েত-চীন-কিউবা মডেলে পার্টি-নিয়ন্ত্রিত বিপ্লব ও বিপ্লব-পরবর্তী একদলীয় রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজ-কাঠামো নির্মাণের স্বপ্ন আজ আর মানুষকে ছোঁয় না। সংসদীয় গণতন্ত্রের খণ্ডিত, খর্বিত, দ্বিচারিতাভ্রষ্ট চরিত্র সত্ত্বেও ভারতীয় জনমানসে তার শেকড় ক্রমশ গভীর। সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব এবং সংগঠন বিস্তারও বিপুল। জাত-পাত, আঞ্চলিকতা, ধর্ম, ভাষার নানা বিভাজন এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক নানা প্রশ্নে বিচিত্র সংঘাতের প্রেক্ষাপটে এই বিপুল দেশটির গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কোনও একবগ্গা নীল নক্সা মেনে সম্ভব নয়। উদার, মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির বে-লাগাম, হিংস্র আক্রমণের মুখে জল-জঙ্গল-জমিনের জন্য লড়াইগুলি সংহত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তা মাওবাদী বা অন্য কোনও বিশেষ দলের কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা সেই সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দেবে।

জঙ্গলমহলে দুপক্ষই শেষ পর্যন্ত এলাকা দখলে আর দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের রাজনীতিতে আটকে থেকেছেন। মমতার ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অগণতান্ত্রিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অসহিষ্ণু মানসিকতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নানা পর্বে প্রমাণিত। অনুগৃহীত, অনুগত, বংশবদদের জন্য তিনি স্নেহশীলা দিদি, কল্পতরু বিশেষ। কিন্তু ভিন্নমতের স্পর্ধা দেখালেই তাঁর রোষে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে। গত একবছরে একের পর এক ঘটনায় তা প্রমাণিত। ইন্টারনেটে কার্টুন ফরোয়ার্ড করে বা মোবাইলে মানেসরে মারুতি শ্রমিকদের প্রতি, নোনাডাঙায় উচ্ছেদের শিকার গরিব প্রান্তজনদের প্রতি সহমর্মিতা ও সরকারের দমননীতির বিরোধিতা করায় সমালোচকদের কপালে জুটছে মারধোর, পুলিশি হয়রানি, মামলা-মোকদ্দমা বা হাজতবাস। তাঁদের মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু শহুরে মধ্যবিত্ত নয়, জঙ্গলমহলে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় তাঁর প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরির বাস্তব ফলশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে জেলে যেতে হলো ছাপোষা কৃষককেও। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এরা সবাই মাওবাদী। নানা শক্তির সমাহারে জমি আন্দোলনের জেরে বিপুল জনাদেশে ক্ষমতাপ্রাপ্তির পরও তাঁর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ হয়নি। উল্টে সিপিএমের দলতন্ত্রের বদলে ব্যক্তিপূজার কাল্ট গড়ে তুলেছেন এক বছরেই। কেউ কেউ আশা করেছিলেন, ভারতীয় রাজনীতির একটি নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মোচন করবেন তিনি। যেখানে নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকার বিদ্রোহী, বিপ্লবীদের জন্য, নিদেনপক্ষে জনসাধারণের কমিটির মতো একটি আদতে গণ-সংগঠনের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে হলেও রাজনৈতিক পরিসর ছাড়বেন। কিন্তু রাজ্য জয় করেও তাঁর ভয় যায়নি। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, আর দশটি ছোট শরিকের মতো ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পেয়ে মাওবাদীরা সন্তুষ্ট থাকবে।

অন্যদিকে মাওবাদীরা বুঝতে চাইলেন না, সিপিএম-বিরোধী আন্দোলনের পর্বটির সঙ্গে নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতির গুণগত ফারাক ঘটে গেছে। ওই আন্দোলনের সমর্থকরা রাজনৈতিক পালাবদল চেয়েছিলেন। তাঁরা নতুন সরকারকে সময় দিতে চান। ২০০৮ সাল থেকে রক্তাক্ত জঙ্গলমহল ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। তাঁরা যুদ্ধাবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান। জনভিত্তি টলে গেছে জেনেও মাওবাদী নেতৃত্ব এলাকা ধরে রাখতে খুনোখুনি চালিয়ে গিয়েছেন, একমাস 'যুদ্ধবিরতি'র আগে ও পরে। এতে নয়া সরকারের ও শাসকদলের দমন-পীড়নের পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে। বন্দীমুক্তি এবং আন্দোলনের মূল দাবিগুলি নিয়ে নতুন করে দাবি সনদ পেশ করেছিল জনসাধারণের কমিটি। কিন্তু কমিটির প্রথম পর্বের গণতান্ত্রিক চরিত্র পুনরুদ্ধারের প্রয়াস দেখা যায়নি। ফলে মাওবাদী নেতৃত্বের থেকে কমিটির আলাদা অস্তিত্ব স্থানীয় মানুষ বা কলকাতার নাগরিক সমাজের চোখে ধরা পড়েনি। প্রাথমিক দোলাচলের পর মাওবাদী নিকেশে তৎপর সরকারি শিবিরও কমিটিকে মিছিল-সমাবেশ করতে দেয়নি। যৌথবাহিনীকে প্রথম কয়েকমাস রাশবন্দী রাখলেও শান্তি-উদ্যোগের মাঝপথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অবনতি ঘটতেই ফের অভিযান চালু হয়। তৃণমূল স্তরে একদা-বন্ধুরাই বিভীষণের ভূমিকা নেয়। আর পরিণতিতে কিষেনজির তথাকথিত 'সংঘর্ষে' ভয়ঙ্কর মৃত্যু।

মধ্যস্থবৃন্দ ও তাঁদের বিরোধীরা

পরবর্তী সময়ে শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থদের ভূমিকা নিয়ে কাঁটাছেড়া তীব্র হয়েছে। তবে তা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বদলে নীতিগত প্রশ্নগুলি নিয়ে বিতর্কে কেন্দ্রীভূত হলে আমরা অনেকেই স্বস্তি পেতাম এবং লাভবান হতাম। গোটা প্রক্রিয়াটিকে বাইরে থেকে অনুসরণ ও অনুধাবনের চেষ্টা থেকে বলতে পারি, মধ্যস্থরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অলীক আশা এবং বিভ্রমে জড়িয়েছিলেন। নিজেদের এবং অন্যদেরও। সেকারণে অন্ধ্রের 'কমিটি অব কনসার্নড সিটিজেনস' বা সিসিসি-র মতো সরকার-নিরপেক্ষভাবে নাগরিক সমাজের নিজস্ব আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-উদ্যোগ গড়ে তোলার দায় তাঁরা অনুভব করেননি। সরকার ও মাওবাদীরা ছাড়াও যে আরও অনেক 'স্টেক-হোল্ডার' আছে, তা তাঁরা মানতে চাননি। জঙ্গলমহলের ভিতরে-বাইরে বৃহত্তর জনমতের পরিসরটিতে শান্তি-সামাজিক ন্যায়-উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র-দলতন্ত্র-ক্ষমতাতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বহু ধানধারণা রয়েছে। এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকেই যে কোনও রঙের একদলীয় শাসনের বিরোধিতায় জনমত প্রতিধ্বনিত। তাকে বোতলবন্দী করে ভোটবাক্সে ঢোকানোই যে পরিবর্তনের পরাকাষ্ঠা নয়, এই বোধ নাগরিক সমাজের সকল কুশীলবদের মধ্যে শুরুতেই সঞ্চারিত হলে জঙ্গলমহলের শান্তি-উদ্যোগের একটি ভিন্ন চেহারা আমরা দেখতে পেতাম।

অন্ধ্রের তৎকালীন সরকার ও মাওবাদীদের উপর জনমতের চাপ সৃষ্টি এবং শান্তি-আলোচনার সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্মাণে সিসিসি-র ভূমিকা এখানে বিশদে বলার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে জি হরগোপাল, ভারভারা রাও এবং অন্যান্যরা *ওয়ার অ্যান্ড পিস ইন জঙ্গলমহল* সংকলনে বিস্তৃত লিখেছেন। এছাড়া সিসিসি-র নিজস্ব প্রতিবেদনগুলি তো আছেই। এতে স্পষ্ট, সরকার ও বিপ্লবীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করলেও মধ্যস্থবৃন্দ ও সিসিসি-র স্বাধীন, স্বতন্ত্র অবস্থান ছিল। এবং তাঁদের নৈতিক শক্তির উৎস ছিল নাগরিক সমাজ। ছত্রিশগড়, ওড়িশা ও অন্ধ্রে মাওবাদী-সরকার আলোচনায় নানা পর্বে যুক্ত অধ্যাপক হরগোপাল এ রাজ্যের জঙ্গলমহলে শান্তি-উদ্যোগের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে লিখেছেন: ''এ থেকে নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠনগুলির শিক্ষা নেওয়া উচিত যে রাষ্ট্রের বা সরকারের বদলে তাদের কর্মকাণ্ডের ফোকাস হওয়া উচিত নাগরিক সমাজ। পশ্চিমবঙ্গে যারা শান্তি-আলোচনায় উদ্যোগী হন তাঁরা প্রশাসনের উপর সামাজিক চাপ নির্মাণের চেয়ে মমতার ফাঁকা বুলিতে (rhetoric) বেশি ভরসা রেখেছিলেন। সেকারণেই শান্তি প্রক্রিয়াটি জোরদার করার বদলে তড়িঘড়ি তা সম্পূর্ণ করার উপর জোর দেওয়া হয়।'' হরগোপালের আরও মন্তব্য : ''বস্তুত সিটিজেনস ফর পিস ইনিশিয়েটিভ (দিল্লি-ভিত্তিক একটি সংগঠন) জাতীয় স্তরে এই শান্তি-আলোচনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতের মানুষকে সংগঠিত করায় আগ্রহী ছিলেন। কলকাতায় একটি পদযাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিনায়ক সেন স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব নেন এবং এই লক্ষ্যে দুবার কলকাতা সফরে যান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শান্তি-উদ্যোক্তারা অন্যান্য সংগঠনগুলির সঙ্গে সমবেত উদ্যোগ গ্রহণে কোন আগ্রহ দেখাননি।'' আশা করি সুজাত ভদ্ররা এই সমালোচনার জবাব দেবেন এবং বন্দীমুক্তি প্রশ্নে গঠিত রিভিউ কমিটির সুপারিশসমূহ এবং তার ফলশ্রুতি সংক্রান্ত তথ্যাদি জনসাধারণের গোচরে আনবেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খেলাপের কারণে সরকারের সমালোচনা করবেন, তথা সাম্প্রতিক দমনমূলক কার্যকলাপের নিন্দায় সোচ্চার হবেন।

পাশাপাশি তাঁদের সমালোচকরাও কি ঈপ্সিত ভূমিকা পালন করেছেন? একেবারেই না। ভারভারা রাও, হরগোপালের মতো অন্ধ্র, ছত্তিশগড়, ওড়িশার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানবাধিকার কর্মীরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির লাগাতার দ্বিচারিতা সত্ত্বেও যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে বিধ্বস্ত আমজনতার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির চাহিদা মনে রেখে শান্তি আলোচনার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন, তখন প্রকৃত ও লাগাতার শান্তির প্রাক্‌শর্তগুলি যথাযথ পূরণের দাবিতে জনমত সংগঠিত করার বদলে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যস্থদের বিরোধীরা শান্তি-উদ্যোগটির প্রতি শীতল, বিদ্বিষ্ট মনোভাব দেখিয়েছেন। অথচ একে কেন্দ্র করেই স্বাধীন, বহুস্বরীয় নাগরিক সমাজের পরিসর বাড়ানো যেত। বিগত জুলাইতে দুটি কনভেনশনে সুজাত ভদ্র ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধীদের বন্দীমুক্তি ও যৌথবাহিনী প্রত্যাহার প্রসঙ্গে চাপানউতোর হলেও শান্তি-আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনও তর্কবিতর্ক শুনিনি। সুজাতদের সমালোচকরাও বিপুল জনাদেশে জয়ী নতুন সরকারের সঙ্গে মাওবাদী নেতৃত্ব এবং জনসাধারণের কমিটির প্রতিনিধিদের আলোচনার গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃহত্তর নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণের দায় অনুভব করেননি। শুধু সরকার ও মধ্যস্থদের সমালোচনা করেছেন। মাওবাদীদের দ্বারা খুনোখুনির বিরোধিতায় সোচ্চার হননি। জঙ্গলমহলের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বুঝতে চাননি। বন্দীমুক্তি, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার ইত্যাদি ন্যায্য দাবিগুলি যে শান্তি আলোচনার সঙ্গে জড়িত, এই সত্যটাকে এড়িয়ে গেছেন। পরিণতিতে আজ এ রাজ্যে মানবাধিকার আন্দোলন বিভক্ত। পারস্পরিক বিদ্বেষ, ঘৃণা, তিক্ততা মহাভারতের মূষল পর্বের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। প্রশ্ন ওঠে, বেড়ালদের ঝগড়ায় বাঁদরের ষোলো আনা পিঠেপ্রাপ্তি ঘটলেও এতে জঙ্গলমহলের মানুষ কী পেলেন?

শেষ কথা

আমার বক্তব্য নিয়ে অনেকেরই মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবু পরিশেষে বলি, লালগড় আন্দোলনের সামগ্রিক ইতিহাস এবং

তার সাফল্য-ব্যর্থতার নির্মোহ বিশ্লেষণ অনেক বড় মাপের কাজ। আগ্রহ থাকলেও সে মাপের যোগ্যতা আমার নেই। আন্দোলনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত অনেকে নানাদিক নিয়ে ইতিমধ্যে লিখেছেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কাজ এখনও শুরু হয়নি। তাই এই পরিস্থিতিতে লালগড় আন্দোলন এবং জঙ্গলমহলের জনসমাজ ও জনমানসে তার প্রভাব, সাফল্য-ব্যর্থতার সামগ্রিক বিশ্লেষণের জন্য গবেষণামূলক উদ্যোগ ভীষণ জরুরি। অ্যাকাডেমিকরা, যেমন রণবীর সমাদ্দার তাঁর *মেমরি, আইডেনটিটি, পাওয়ার, পলিটিক্স ইন দ্য জঙ্গলমহলস, ১৮৯০-১৯৫০* বইটিতে ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে স্বাধীনতার প্রথম পর্যায় পর্যন্ত কালসীমায় জঙ্গলহলের রাজনীতি ও সমাজকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এরকম বিশেষ কালপর্বের ইতিহাসচর্চা জঙ্গলমহলকে ঘিরে আরও কিছু হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক অতীত নিয়ে এধরনের কাজের নানা সমস্যা ও বিপদ আছে। বিজয়ী ও পরাভূত শিবিরের কুশীলবদের নিজস্ব মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন ও ঘাত-প্রতিঘাতের নানা গোপন কাহিনী এখনও অন্তরালে। আমজনতার ক্ষত এখনও দগদগে। তাঁরা আজও ভীতসন্ত্রস্ত। এক দলের 'হেজিমনিক পলিটিক্স'-এর বদলে আর একটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে তাঁরা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। এই অবস্থায় বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর ইতিহাসের কাঁচামাল পেতে গেলে অপেক্ষা করাই ভালো বলে অনেকে মনে করছেন। আবার প্রশ্ন ওঠে, মহাফেজখানার ঠান্ডাঘরে হিমশীতল তথ্য-আকরে পরিণত হওয়ার আগে, কয়েক প্রজন্মের ব্যবধানে স্মৃতি ধূসরতায় বিবর্ণ হওয়ার আগে সমসাময়িক একটি রক্তাক্ত কালপর্ব, তুমুল আন্দোলনের প্রাণস্পন্দনকে বোঝার চেষ্টা করা যাবে না কেন? আমরা তো মমি-বিশারদ হতে চাইছি না। তাহলে? এই টানাপোড়েনের জেরে অনেকে থমকে আছেন।

লালগড় আন্দোলনের পর্বে নানা সংহতি আন্দোলনের শরিকরাও মাওবাদীদের সঙ্গে অন্যান্যদের তৎকালীন বিতর্কগুলিকে 'খুঁচিয়ে তুলতে' অনাগ্রহী নানা রাজনৈতিক কারণে। কেউ কেউ মনে করেন, বিতর্কগুলির প্রাসঙ্গিকতা আর নেই। আবার কেউ কেউ শঙ্কিত, এতে 'শত্রু'পক্ষের সুবিধা হবে। আমি স্পষ্টতই তাঁদের সঙ্গে একমত নই। যথাযথ সময়ে সমালোচনাগুলি প্রকাশ্যে না এনে জঙ্গলমহল আন্দোলন এবং নাগরিক সমাজ দুইয়েরই ক্ষতি করা হয়েছে। কাগজে-কলমে বা ইন্টারনেটে প্রকাশিত বিতর্কগুলি ছাড়াও অ-নথিবদ্ধ বা অপ্রকাশিত ভিন্নমতগুলিকেও ধরে রাখা উচিত ভবিষ্যতের স্বার্থেই। আন্দোলন-সংগঠনে বহুস্বর তার প্রাণস্পন্দনের রেখচিত্র। তা রোগ-নির্ণয়ের সহায়কও বটে।

কবীর সুমনের গান

মম চিত্তে শিলাদিত্যে
হাতে নাতে আমি ধরবোই
আমি ধরবোই
জেলে পুরবোই
মম ভৃত্য হবে নিত্য শিলাদিত্য
আমি পারবোই আমি পারবোই
মেরে ছাড়বোই
প্রতিবাদী —মাওবাদী হতে বাধ্য
প্রতিবাদের করে ছাড়বো
আমি শ্রাদ্ধ
পরিবর্তন গলা কর্তন
প্রতিপাদ্য
গলা কই কই গলা কই কই গলা কই কই

ক্ষমা করো রবিঠাকুর তুমি জানো
এ মুহূর্তে প্যারডিতে আছি কেন
বড়ো সুন্দর মিলে গেল ছন্দটা...

সব্যসাচী গোস্বামীর কবিতা

প্রশ্ন তোলা

আবহাওয়াবিদ জানে, কোন্ মেঘে কোন্ মেঘ উদাসীন
কোন্ মেঘে ভরা থাকে বৃষ্টির জল।

বাজারের দালাল জানে লেন-দেন, বিকিকিনি
ফাটকার খেল— টাকা কামাবার কৌশল।

ধর্মব্যবসায়ী জানে কোন্ মন্ত্রে কীরকম বিষে
শবসাধনার ইন্ধন।

কবে কোন্ প্রশ্ন তুললে গলা টিপে ধরতে হয়
জানে দুঃশাসন।

কোন্ প্রশ্নে বিদ্রূপ? কোন্ প্রশ্ন সময়ের প্রতীক?
কোন্ প্রশ্ন বেপরোয়া? কোন্ প্রশ্ন করলে তুমি রাজদ্রোহী ঠিক?

কোন্ প্রশ্ন অনির্বান? কোন্ প্রশ্ন ফিরে ফিরে আসে?
কোন্ প্রশ্ন বেঁচে থাকে, রক্তচক্ষু—রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে?

কোন্ প্রশ্ন একরোখা? কোন্ প্রশ্নে অস্বস্তি?
কোন্ প্রশ্ন তুলতেই শিলাদিত্যের ঠিকানা শ্রীঘর?

প্রশ্ন ওঠা ভয় পায় ক্ষমতায় অন্ধ শাসক
প্রশ্ন তবু উঠবেই — প্রশ্ন ওঠা দীর্ঘজীবী হোক।

প্রবন্ধ

বিশ্বজোড়া স্থবিরতা ও চীন

জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডবলিউ ম্যাকচেসনি

২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের বিশাল আর্থিক সংকট শুরুর পাঁচ বছর পরেও বিশ্ব অর্থনীতির স্বাস্থ্য পুরোপুরি ফিরে আসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখন চিন্তা আর্থিক সংকট ও মন্দার জায়গায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির শ্লথগতি বা স্থবিরতা নিয়ে। অনেকে একে বলছেন বিশাল স্থবিরতা। এই স্থবিরতা আর আর্থিক সংকট একে অন্যকে পুষ্ট করছে।

কয়েকটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ যেন এই সাধারণ প্রবণতার বাইরে— সেগুলিতে প্রবৃদ্ধি হয়েই চলেছে। এই দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চীন। চীন এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পরেই।

এমন সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টিন লাগার্দে একটি সতর্কবার্তা উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন যে অর্থনীতির মন্দগতি থেকে ''এশিয়া একেবারে মুক্ত নয়''। এই সতর্কবার্তা রীতিমতো ভীতির সঞ্চার করল। অনেকেই ভয় পেলেন যে চীনের অর্থনীতিতে বোধহয় মন্দা আসতে চলেছে। তখন লাগার্দে ভরসা দিলেন— না, এখনই এমন বিপদের আশঙ্কা নেই।

কিন্তু চীনের অর্থনীতি নিয়ে দুশ্চিন্তা চলতেই থাকছে। খুব কম অর্থনীতিবিদই মনে করেন, চীনের এই প্রবৃদ্ধি চলতেই থাকবে। বেশির ভাগই মনে করেন যে চলার অভিমুখ না বদলালে চীন এক বিরাট সংকটে পড়বে। মর্গান-স্ট্যানলির চেয়ারম্যান স্টিফেন রোচ বলেছেন যে চীনের রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতি দুটি সতর্কবার্তা পেয়েছে— বিশাল আর্থিক সংকট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির নিম্নগতি আর এখন ইউরোপের চলতি সংকট। চীনের এই দুটি বৃহত্তম রপ্তানি-বাজারকে আর চাহিদার নির্ভরযোগ্য বাজার বলে ধরা যায় না।

আগতপ্রায় সংকটকে এড়াতে অর্থনীতিবিদরা সবাই বলছেন যে, চীনের উচিত বিনিয়োগ ও রপ্তানির উপর অতি-নির্ভরতা কমানো। দেশের মধ্যে ভোগের কম চাহিদার বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়ে বিনিয়োগ, রপ্তানি ও দেশের মধ্যেকার ভোগের মধ্যে ভারসাম্য আনা দরকার। কিন্তু, মুশকিল হলো, এই ধরনের ভারসাম্য আনতে গেলে ব্যবস্থাটারই পরিবর্তন করতে হয়, চীনের বর্তমান পুঁজিবাদের ভিত্তিটিরই পরিবর্তন করতে হয়। কারণ এই ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়েই রয়েছে কম মজুরি দেওয়ার মাধ্যমে পুঞ্জীভবনের উপর, গ্রাম-শহরে ফারাকের মধ্যে যার মূল।

এইসব আলোচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে চীনে জনবিক্ষোভ, প্রতিবাদ দিন দিন বেড়ে চলার ফলে। প্রতি বছর হাজার হাজার গণ প্রতিবাদের ঘটনা ঘটছে। এইসব ঘটনা 'বাজারমুখী সংস্কারের' মডেলটিকে থামিয়ে দিতে চাইছে, এমনকি তাকে উল্টে দিতে চাইছে। চীনের রপ্তানি ক্ষেত্রের উৎপাদন অনেকটাই নির্ভর করে দেশের মধ্যেই পরিযায়ী কম-মজুরির শ্রমিকদের উপর। এটা চীনের সমাজের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি কৃষকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে পরিবেশগত সমস্যাও। এসব দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিকাশের বর্তমান পথটি টেকসই নয়।

চীনের সমস্যা শুধু দেশের মধ্যে নয়। বিশ্বজোড়া যে সরবরাহ ব্যবস্থা চীনকে বিশ্বের কারখানা বানিয়েছে তা বিদেশি পুঁজি ও বিদেশের বাজারের ওপর নির্ভরশীল। আবার, চীনের অর্থনীতিতে কোনো ফাটল দেখা দিলে তার প্রভাব পড়বে এই বাজারগুলিতেও। চীনে যদি বড়োসড়ো কোনো অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তাহলে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই ফাটল দেখা দেবে।

চীনা চরিত্র সহ পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বসমূহ

চীনের অর্থনীতি যে নানা দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এ কথায় অনেকেই অবাক হবেন। কারণ চীনের অর্থনীতি যত বৃদ্ধি পেয়েছে চীনের অর্থনীতি নিয়ে রূপকথা বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে। গত জুলাইয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল: ''চীন কবে বিশ্বের দখল নেবে? মুহূর্তটি প্রতি মিনিটে এগিয়ে আসছে। এইচএসবিসি বলছে, ২০৫০ সালে চীন সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হবে। ডয়েশ ব্যাংক বলছে, না, ২০৪০ সালেই হয়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে, না, না, ২০৩০ সাল। গোল্ডম্যান স্যাকস বলছে, ২০২০ সালেই এ ঘটনা ঘটবে। কয়েক সপ্তাহ আগে আইএমএফ ঘোষণা করেছে, ২০১৬ সালে চীনের অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে।'' হার্ভার্ডের ঐতিহাসিক নিয়াল ফার্গুসন আবার এরও এক কাঠি ওপরে। ২০১১ সালে তিনি ঘোষণা করেছেন, এ হারে চলতে থাকলে ২০১৪ সালেই দেশের ভেতরকার ক্রয়ক্ষমতার বিচারে চীনের অর্থনীতি মার্কিন অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যাবে।

চীন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে, এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্বে ক্ষমতার কেন্দ্রে বেশ অস্বস্তি। কিন্তু চীন-বাণিজ্য আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও জাপান, এই ত্রিশক্তির লাভের বিরাট উৎস। তাকে বাদ দেওয়াও যায় না। শেষ কয়েক বছরের দ্রুত প্রবৃদ্ধি বিশ্বে চীনের অর্থনৈতিক ভূমিকাকে আরও জোরদার করেছে। চীনের এই প্রবৃদ্ধি ২০০৭-০৯-এর বিশ্ব আর্থিক সংকট থেকে মুক্তির একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে।

অনেকে অলীক কল্পনা করেন যে আজকের ভয়ানক

(ডেসপারেট) পরিস্থিতিতে চীন বিশ্বের অর্থনীতিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, উন্নত দেশগুলিকে স্থবিরতা থেকে, পেটের কষি আঁট করে বাঁধার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। অর্থাৎ আগামী কয়েক দশকে চীন পুঁজিবাদকে প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি সরবরাহ করবে, যাতে করে এ ব্যবস্থাটা আর একটু সময় পায়। অনেকটা গত তিরিশ বছর ধরে মার্কিন নেতৃত্বে ঋণ আর আর্থিক বিকাশ যা করেছে। কিন্তু এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেহাতই কম।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সতর্ক করে বলছে, "এ নিয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত হবেন না। চীনের এই ম্যাজিকের পেছনে অনেক সমস্যা ধূমায়িত হচ্ছে।" তারা বলেছে জন-বিক্ষোভের কথা (২০১০ সালে জন-বিক্ষোভের সংখ্যা ছিল ২,৮০,০০০)। বলেছে অতি-বিনিয়োগের কথা, উৎপাদনী ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকার কথা, ভোগের ক্ষেত্রে দুর্বলতার কথা, আর্থিক বেলুনের কথা, কাঁচামালের বেশি দামের কথা, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা, দীর্ঘকালীন বিচারে শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য কমার কথা, পরিবেশ ধ্বংসের কথা। ওরা বলেছে, "অন্য কিছু না হলেও চীনের সামনে এখন এত বড় বড় সমস্যা রয়েছে তাতে তাদের পক্ষে বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।" নিকট ভবিষ্যতে চীনে ঠিক কী ঘটবে সেটা তাই সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না, আর তার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়েও অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। চীন যে শুধু বিশ্ব অর্থনীতিকে বাঁচাতে সক্ষম না হতে পারে তাই নয়, এ দেশটি নিজেই হয়তো বিশ্ব পুঁজিবাদী শৃঙ্খলে দুর্বলতম যোগসূত্র।

চীনের প্রবৃদ্ধির অসাধারণ হার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের মতো ধনী দেশগুলি যেখানে ১৯৮০ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে আর্থিক বুদ্বুদ ছাড়া কখনো এই স্থবিরতাকে অতিক্রম করতে পারে নি, সেই একই সময়ে চীনের অর্থনীতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে— এই বৃদ্ধির শুরু মাও-আমল থেকেই। মুমূর্ষু ধনী দেশগুলো যখন আদৌ কোনো বৃদ্ধি ঘটাতে হিমসিম খাচ্ছে চীন তখন দিব্যি দু অংকের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে।

একটা হিসেব দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে কোনো অর্থনীতি প্রতি ৭ বছরে দ্বিগুণ হবে। ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে ৩৬ বছর, ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলে ৭২ বছর।

উন্নত পুঁজি-সমৃদ্ধ দেশগুলিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মন্দা চলছে দীর্ঘকাল। পাশাপাশি রয়েছে উদ্বৃত্ত পুঁজি ব্যবহারের সমস্যা বা অতি-সঞ্চয়ের সমস্যা। নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির মতো পরিণত দেশগুলি বার্ষিক ৩ শতাংশ বা এমনকি ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেই বলতে হবে ভাগ্য ভালো। ১৯৯২ থেকে ২০১০ পর্যন্ত জাপানের বৃদ্ধির গড় হার ছিল ১ শতাংশ। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের হিসাব অনুসারে, ২০১১-১২ সালে উন্নত অর্থনীতিগুলি মাত্র ১-১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। এর বিপরীতে, চীনের বৃদ্ধির হার ১০-১২ শতাংশ।

উন্নত দেশগুলির সমস্যা আরো বাড়ছে দুটি কারণে: (১) অর্থনীতিকে স্থবিরতা থেকে মুক্ত করার জন্য আর্থিকীকরণের ওপর অতি নির্ভরশীলতা; (২) কর্পোরেট আউটসোর্সিং— অর্থাৎ উৎপাদনকে বিশ্বের দক্ষিণের দেশগুলিতে নিয়ে যাওয়া। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে বিশ্বের পরিধির কয়েকটি দেশে, যদিও মুনাফার সিংহভাগই জমা হচ্ছে পুঁজিবাদী কেন্দ্রের দেশগুলিতে। তাদের পুঁজি আরও বাড়ছে। তাতে স্থবিরতার সমস্যাও আরও বাড়ছে।

পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামোগত সংকট যত গভীর হচ্ছে, অনেকেই আশা করছেন যে চীনের প্রবৃদ্ধি বিশ্বের এই স্থবিরতা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অবস্থায় একটা ভারসাম্য আনবে। কিন্তু তা যে হওয়ার নয় সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় চীনের দ্বন্দ্বগুলি চীনের অর্থনীতিতে সমস্যা তৈরি করায়। এর ফলে বিশ্ব বাণিজ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে।

মজার ব্যাপার হলো চীনের অর্থনীতি নিয়ে এই আতঙ্কের কারণ অংশত নিহিত আছে চীন যে পথে বিরাট আর্থিক সংকট থেকে উদ্ধার পেল সেই পথের মধ্যেই— যে পথকে অনেকে মনে করেছিলেন চীন যে পশ্চিমের ভাগ্য থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে, একটা অদম্য প্রবৃদ্ধির যন্ত্র হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ। বিশ্বজোড়া সংকট আর তার ফলে বিদেশ-বাণিজ্য মার খাওয়ায় চীন সরকার ২০০৮ সালে ৫৮৫০০ কোটি ডলারের একটি পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলিকে তাঁরা আক্রমণাত্মকভাবে ঋণ দিতে বলেন। বিশেষত স্থানীয় সরকারগুলি শহর বিস্তারের জন্য বিরাট পরিমাণ ঋণ নেয়, স্থাবর সম্পত্তি ঘিরে ফাটকা বাড়ে। এর ফলে খুব শীঘ্রই চীনের অর্থনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ২০০৯ সালের প্রথমার্ধে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.১ শতাংশ, আর তার মধ্যে ৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পেছনে ছিল রাষ্ট্র নির্দেশিত বিনিয়োগ। তা ঘটানোর জন্য স্থির বিনিয়োগ বিশাল পরিমাণে বাড়ানো হয়, তা রপ্তানির ঘাটতি পূর্ণ করে।

২০০৭-১০ সালের মধ্যে চীনে মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতাংশ ৭ পয়েন্ট বেড়েছে। অন্যদিকে বাণিজ্য ও ভোগ দুটিই কমেছে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৫ পয়েন্ট, ভোগের ক্ষেত্রে ২ পয়েন্ট। জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে সরকারি ব্যয় একই থেকেছে। বর্তমানে শুধু বিনিয়োগই জিডিপি-র ৪৬ শতাংশ, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য যৌথভাবে ৫২ শতাংশ।

চীন বিশেষজ্ঞ মাইকেল পেটিস ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সংকটের ফলে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত কমে গিয়ে হয়ত "প্রবৃদ্ধির হারকে শূন্যে নামিয়ে আনত"। কিন্তু "হঠাৎ বিনিয়োগের মাত্রা

ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে দিয়ে'' ''ভারসাম্য এনে প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার বজায় রাখা গেছে''। অবশ্য ২০০২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জিডিপি-তে বিনিয়োগের অংশ যে ১০ শতাংশ-পয়েন্ট বেড়ে গেছে তার পেছনে জিডিপি-তে ভোগের অংশ কমে যাওয়ার ভূমিকাও কম নয়। এই সময়ের মধ্যে জিডিপি-তে ভোগের অংশ ৪৪ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৩৪ শতাংশ— বিশ্বের বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে এই হার সর্বনিম্ন।

বিনিয়োগের হার প্রায় ৫০ শতাংশ হওয়ায় এখন চীনের অর্থনীতির সামনে দেখা দিয়েছে অতি-সঞ্চয়ের সমস্যা। মার্কিন বিশেষজ্ঞ নুরিয়েল রুবিনি বলেছেন:

সমস্যাটা এই যে, কোনো দেশই তার জিডিপি-র ৫০ শতাংশ বিনিয়োগ করার মতো উৎপাদনশীল হতে পারে না, এটা করলে অতি-উৎপাদনক্ষমতা (ওভারক্যাপাসিটি) ও কাজে না লাগানো ঋণের (নন-পারফর্মিং লোন) সমস্যা বিরাটভাবে দেখা দেবে। চীনে যন্ত্রাদিতে বিনিয়োজিত পুঁজি (ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল), পরিকাঠামো ও সম্পত্তিতে অতিবিনিয়োগ বেশ বেশি। সে দেশে গেলে দেখা যাবে দারুন দারুন এয়ারপোর্ট, বুলেট ট্রেন— কিন্তু তাতে যাত্রী নেই, হাইওয়ে রয়েছে— কিন্তু সেগুলি তেমন কোথাও পৌঁছে দেয় না, বিরাট বিরাট ফাঁকা সরকারি ভবন, ভুতুড়ে শহর, ঝকঝকে কারখানা কিন্তু তাতে উৎপাদন করা হয় না, অতি-উৎপাদনের ফলে যাতে বিশ্বে সেসব পণ্যের দাম পড়ে না যায়।

বাণিজ্যিক ভবন ও দামী বাসস্থানের জন্য বিনিয়োগ হয়েছে খুব বেশি মাত্রায়, গাড়ি কারখানায় উৎপাদনক্ষমতা এত বেশি যে সম্প্রতি গাড়ি বিক্রি অনেক বাড়লেও অতটা উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ইস্পাত, সিমেন্ট ও অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রেও অতি-উৎপাদনক্ষমতা আরো বাড়ছে। এর ফলে মূল্যহ্রাস (ডিফ্লেশন) দেখা দেবে, প্রথমে তা দেখা দেবে ম্যানুফ্যাকচারিং আর স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে। আর খুব সম্ভবত ২০১৩ সালে চীন একেবারে ধপাস করে পড়বে। সর্বদাই দেখা গেছে অতি-বিনিয়োগের ফলে সংকট অথবা দীর্ঘ সময় ধরে শ্লথগতির প্রবৃদ্ধি দেখা দিয়েছে।

অতি-বিনিয়োগ আর তার সাথে আর্থিক ভঙ্গুর অবস্থা 'চীনা বুদবুদের' প্রশ্নটা নিয়ে এসেছে। সরকার স্থির বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়াতে কিছুটা কাজ হয়েছে— খানিকটা কাজ হয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলি বিপুল পরিমাণে ঋণ দেওয়ায় আর স্থানীয়ভাবে ঋণ গ্রহণ বেড়ে যাওয়ায়। এতে প্রধানত শহরের স্থায়ী সম্পত্তির বাজারে ফাটকা বেড়ে গেছে। বিশ্বের মোট ইস্পাত ও কংক্রিট উৎপাদনের অর্ধেকটা এবং ভারি নির্মাণ যন্ত্রাদির অনেকটাই আজ ব্যবহৃত হয় চীনে শহরের প্রসার ঘটানোর কাজে। আর চীনের মোট জাতীয় আয়ের ১৩ শতাংশ আসে নির্মাণ শিল্প থেকে।

ফোর্বস ম্যাগাজিন যদিও জানাচ্ছে যে চীন 'বিরাট লাল বুদবুদ' নিকট ভবিষ্যতে ফেটে যাওয়ার বিপদ রয়ে গেছে, পাশাপাশি ২০১১ সালেই কিন্তু ম্যাগাজিনটি তার পাঠকদের সতর্ক করে বলছে যে ''চীনের স্থায়ী সম্পত্তির বাজারটি ছোঁয়াচে অসুখের মতো দ্রুত বেড়ে চলেছে''। তাদের প্রশ্ন: '' চীনের গৃহ-বাজার: কখন এই বুদবুদটি ফাটবে আর কত জোর বিস্ফোরণ হবে তাতে?'' তবে পাশাপাশি তারা আশ্বাস দিচ্ছে যে ''চীনের সম্পত্তি-বুদবুদটি ভিন্ন ধরনের'', কারণ সে দেশের সরকারি ব্যাংকগুলি তার ওপর কড়া নজর রাখে।

জ্ঞানী ও দূরদর্শী চীনা সরকার তার চলার পথের সব বাধা দূর করতে পারে, আর চীনা অর্থনীতি এরকম দু অংকের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েই চলবে— এ দুটি ধারণার উৎস একই। সেটি একটি ভুল ধারণা— একটা মায়া, একটা মরীচিকা। আসলে বিশ্ব পুঁজিবাদে চীনের মডেলের অন্তর্ভুক্তির মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব আছে, যা তার বিস্তারে বাধা দেবে।

আর্থিক ক্ষেত্রে তা একেবারে ঠিক। *ফোর্বস* ম্যাগাজিন আশাবাদী হলেও *ফিনান্সিয়াল টাইমস* অন্য কথা বলছে। চীনের আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির কথা বলা হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে সেগুলি অর্থাভাবে ভুগছে। বেশির ভাগ অর্থ চলে যাচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত একটি ছায়া ব্যাংকিং ব্যবস্থায়, আর এই ছায়া ব্যবস্থাটিই এখন অর্থনীতিতে প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার চেয়ে বেশি ঋণ দেয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির পক্ষে এখন সবচেয়ে লাভজনক হলো এই ছায়া ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ দেওয়া।

২০১১ সালের আগস্ট থেকে স্থায়ী সম্পত্তির ব্যবসায় ভাটা শুরু হয়ে গেছে। ঐ মাসে চীনের দশটি সর্ববৃহৎ ডেভলপাররা জানায় যে তাদের বিক্রি না হওয়া পণ্যের পরিমাণ ৫০০০ কোটি ডলার— আগের বছরের চেয়ে ৪৬ শতাংশ বেশি। এই ডেভলপাররা ছায়া-ঋণদাতাদের ওপর নির্ভরশীল আর তারা এখন টাকা ফেরত দাবি করছে। ফলে, নতুন ফ্ল্যাটের দাম ২৫ শতাংশ বা তারও বেশি কমে গেছে। তার ফলে পুরনো ফ্ল্যাটগুলির দামও পড়ে যায়। ২০১১ সালের শেষদিকে বাড়ির দাম কমতে শুরু করে, বিশেষ করে বাসস্থানের দাম অনেকটাই পড়ে যায়— যেখানে ২০০০ সাল থেকে বাড়িঘরের দাম ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

গত বছর জুলাই মাসে হিসেব করে দেখা গেছে, ২০০৭ সাল (ডিসেম্বর) থেকে ২০১১ সাল (মে) পর্যন্ত ব্যাংকগুলির ঋণদানের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছিল, আর গত বছর বৃদ্ধির হার কমলেও তা মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেকটাই বেশি থেকেছে। ঐ বিশ্লেষকের মতে, এর ফলে ২০১০ সালে ব্যাংকের ঋণের হার ছিল জনপ্রতি ৬৫০০ ডলার, যেখানে জনপ্রতি জিডিপি হলো ৪৪০০ ডলার। এই অনুপাতটি দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে। বিশ্লেষকটির মতে, এভাবে চলতে পারে না। এ ছাড়াও আছে হিসেবের বাইরের কিছু ঋণ। স্থায়ী সম্পত্তির

দাম কমার আগেও ব্যাংকের পুঁজির পুঞ্জীভবন যথেষ্ট ছিল না। বিপদে পড়লে সরকারের বিপুল আর্থিক সম্পদের আশ্রয় নেওয়ার উপায় থাকলেও স্থায়ী সম্পত্তির দাম কমে যাওয়া ও নির্মাণশিল্পে ভাটা দেখা দেওয়ার ফলে জিডিপি কমবে, ফলে বাজারের ওপর ভরসা কমে সংকট দেখা দেবে, দেখা দেবে অনিশ্চয়তা ও ভীতি।

২০০৭ সালেই চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ঘোষণা করেছিলেন যে চীনের অর্থনৈতিক মডেলটি ''অস্থিতিশীল, ভারসাম্যহীন, অসমন্বিত ও শেষ বিচারে টিকে থাকার মতো নয়''। পাঁচ বছর পর সেটা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা যার থেকে বেরোনো যাচ্ছে না সেটা হলো জিডিপি-র খুব ছোট একটা অংশই দেশের মানুষের ভোগে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর সেই অংশটা দিন দিন কমছে। ২০০১ থেকে ২০১১, এই এক দশকে এটি জিডিপি-র ৪৫.৩ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩৩.৮ শতাংশ। এই হারটিকে ঠিক করতে গেলে দেশে ভোগের হার অনেক বাড়াতে হবে।

তা করা ২০০৫ সাল থেকেই চীন সরকারের লক্ষ্য, কীভাবে করা যাবে তা নিয়ে প্রস্তাবেরও কমতি নেই। কিন্তু বাস্তবে কোনোটাই করা যায় নি। মাইকেল পেটিস যেমন বলেছেন: ভোগের হার যে কম সেটা কোনো সমাপতন বা আকস্মিক ব্যাপার নয়। প্রবৃদ্ধির এই মডেলে এরকমটাই হওয়ার কথা। কারণ, প্রবৃদ্ধির এই মডেলের গোড়ার কথা হলো নতুন রপ্তানি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অতি-শোষণ। উন্নত প্রযুক্তির কারণে উৎপাদনশীলতা বাড়ে খুব দ্রুত, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি বাড়ে অতি ধীরে। মজুরি যতখানি বাড়ালে জিডিপি-তে ভোগের মাত্রা বাড়বে, তাতে বিদেশি মালিকরা অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টগুলিকে কম মজুরির অন্য দেশে নিয়ে যাবে। তার ফলে এই কারখানাগুলির ওপর নির্ভরশীল চীনা মালিকদের মালিকানাধীন ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলিও বন্ধ হয়ে যেতে থাকবে— এমনিতেই সেগুলি ঋণের চাপে আছে, দুর্নীতি ও পুঁজি পালিয়ে যাওয়ার কারণে অসুবিধার মধ্যে আছে।

চীনে জিডিপি-তে ভোগের মাত্রা কমার কারণ হিসাবে অনেক সময় সেদেশে সঞ্চয়ের উচ্চ হারের কথা বলা হয়, বলা হয় যে সেদেশে জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় মানুষ ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য টাকা জমায়। ১৯৯৩ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে চীনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ৬ কোটি চাকরি কমেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ১৯৯০-এর দশক থেকে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির যে পুনর্গঠন চলছে তার ফলে কর্মীদের চাকরি গেছে। এর ফলে ''লোহার তৈরি ভাতের থালা'', বলা যায় ওয়ার্ক-ইউনিট সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থার কর্মীদের কাজের যে গ্যারান্টি দিয়েছিল সেই গ্যারান্টি ভেঙে যায়। বেকারভাতা, সামাজিক ভাতা, পেনসন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মতো সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান অনেক কমানো হয়েছে। একজন চীন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন:

সরকারি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয়ের অনুপাত ১৯৯০-এর দশক থেকে কমতে শুরু করে। ১৯৮৬ সালে সারা দেশের স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের ৩৯ শতাংশ করত সরকার। ২০০৫ সালের মধ্যে তা কমে আসে ১৮ শতাংশে। স্বাস্থ্য পরিষেবার পয়সা যোগাতে না পেরে অর্ধেক লোক অসুস্থ হলে আর ডাক্তার দেখান না— এটা ২০০৩ সালের সরকারি তথ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। ১৯৯১ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের ৮৪.৫ শতাংশ দিত সরকার। ২০০৪ সালে তা কমে আসে ৬১.৭ শতাংশে। ১৯৮০ সালে গ্রামে উচ্চ-প্রাথমিক স্কুল পাশ করা ছাত্রদের প্রায় ২৫ শতাংশ হাই স্কুলে ভর্তি হতো, ২০০৩ সালে সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র ৯ শতাংশে। শহরেও একই সময়কালে সংখ্যাটা অনেক কমে গেছে— ৮৬ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশে।

এইরকম অবস্থায় নিরাপত্তাহীনতা যেভাবে বাড়তে থাকে তাতে জনগণের সঞ্চয়-সক্ষম একটা ছোট অংশ সঞ্চয়ের হার বাড়িয়ে দেয়।

জনগণের একটা অংশের সঞ্চয় বাড়িয়ে দেওয়াটা ভোগ কমার একটা কারণ হলেও, ভোগ কমার মূল কারণ কিন্তু অসাম্য বাড়া— মজুরির অংশ কমে যাওয়া, বেশির ভাগ পরিবারের আয় কমে যাওয়া। ২০০৭ সালে *ইকনমিস্ট* লিখেছিল: ''জিডিপি-তে ভোগের অংশ বাড়ার অর্থ সঞ্চয় বাড়া নয়, এর অর্থ হলো জাতীয় আয়ের যে অংশটা পরিবারগুলির কাছে যায় (মজুরি হিসাবে, সরকারি ব্যয় হিসাবে এবং বিনিয়োগ থেকে আয় হিসাবে) সেটি কমে যাওয়া। জিডিপি-তে মজুরির অংশ কমেছে সবচেয়ে বেশি নাটকীয়ভাবে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে তা কমেছে ৫৩ শতাংশ থেকে ৪১ শতাংশে।''

চীনের বর্তমান মডেলে যে ভয়ানক শোষণ রয়েছে, আর অসাম্য যেরকম ভয়ানকভাবে বাড়ছে, সেটাই এই ব্যবস্থার মূলে অবস্থিত দ্বন্দ্ব। সরকারিভাবে চীনের শহরবাসীদের উপরের ১০ শতাংশের আয় তলার ১০ শতাংশের ২৩ গুণ। আর যদি গোপন আয়গুলোকে সামনে আনা হয় তবে এই অনুপাতটা হবে ৬৫ গুণ। এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের হিসাব অনুসারে নেপালকে বাদ দিলে চীন পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বেশি অসাম্যের দেশ (মাও আমলে এটি ছিল বিশ্বের সব চেয়ে কম অসাম্যের দেশগুলির একটি)। আমেরিকার একটি দল হিসেব করে দেখিয়েছে, ২০০৫ সালে চীনে আড়াই লক্ষ মিলিওনেয়ার পরিবার ছিল, বাসস্থানকে হিসাবে না ধরলে যাদের মোট আয় ছিল বছরে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলারের বেশি। এরা মিলে দেশটির মোট সম্পদের ৭০ শতাংশের মালিক। চীনের সমাজ এখনও

প্রধানত গ্রামীণ সমাজ। গ্রামের মানুষের আয় শহরবাসীর আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। রপ্তানি-ক্ষেত্রে যে শ্রমিকরা কাজ করেন তাঁদের অধিকাংশ আসলে দেশের মধ্যে পরিযায়ী, এখনও গ্রামের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির যোগ। শহরবাসী শ্রমিকদের তুলনায় তাঁদের মজুরি অনেক কম।

বিশ্বের পণ্য যোগান ব্যবস্থায় চীনের প্রবেশ

একদিকে ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লব এবং অন্যদিকে উইলিয়াম হিন্টন যাকে 'পিছনের দিকে বিশাল যাত্রা' বলেছেন, সাধারণভাবে যাকে 'রিফর্ম পিরিয়ড' বলা হয়, মাওয়ের মৃত্যুর পর ১৯৭৮ সালে দেঙ শিয়াও পিংয়ের আমলে যার শুরু— এই দুটির যোগফল হলো আজকের চীনের অর্থনীতি। চীনের বিপ্লবের পর বিরাট একটা ভূমি সংস্কার করা হয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ভূমি সংস্কারে জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে জমি নিয়ে নেওয়া হয়, কৃষিতে যৌথকরণ করা হয়। ইতিমধ্যে শিল্পে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো আধিপত্যের অবস্থানে চলে এসেছে— শ্রমিক অধিকারের দুদফা ব্যবস্থা যে রূপটি নিল তাকে হিন্টন বলেছেন গ্রামাঞ্চলে 'মাটির তৈরি ভাতের থালা', যাতে কৃষকরা জমির সঙ্গে একটা স্থায়ী সম্পর্কের গ্যারান্টি পেলেন, যাকে আবার যৌথ কৃষি রূপে সংগঠিত করা হলো; আর রাষ্ট্রীয় সংস্থার শ্রমিকরা পেলেন 'লোহার তৈরি ভাতের থালা', যাতে সারাজীবনের জন্য চাকরির ও তৎসংক্রান্ত সুযোগসুবিধার গ্যারান্টি মিললো। (আর 'সোনার তৈরি ভাতের থালা'ও ছিল, সুবিধাভোগী রাষ্ট্রীয় আমলাদের সুযোগসুবিধাকে বলা হতো 'সোনার তৈরি ভাতের থালা')

মাও জমানার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিলো চমকপ্রদ। মাঝে মাঝে যদিও পিছিয়ে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে, পার্টির মধ্যে সংগ্রাম চলেছে (যা শেষ হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এসে)। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুসারে, ১৯৬৬-৭৬, এই এক দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ। আর শিল্প উৎপাদন বেড়েছিল গড়ে ১০ শতাংশ হারে। এই সময়ে প্রায় শূন্য থেকে ভারী শিল্প ও হালকা শিল্প, দুয়ের জন্যই বিরাট পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। পরিবহন ও বিদ্যুৎ পরিবহনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। মাও আমলের শেষে এসবে কাজ করছিলেন ১০ কোটি লোক। পরবর্তী বাজার-সংস্কারের সময় এই পরিকাঠামোরই সুযোগ নেওয়া হয়। এক বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, ১৯৭৭ সালে চীন জনপ্রতি ৩০-৪০ শতাংশ বেশি (ভারতের তুলনায়) খাদ্য উৎপাদন করছিল, আর তা করছিল ১৪ শতাংশ কম কৃষিযোগ্য জমিতে; এবং তা তাদের ৫০ শতাংশ বেশি জনগণের মধ্যে অনেক বেশি সাম্যের ভিত্তিতে বণ্টন করছিল।

বিরাট বিপরীত যাত্রা পাশাপাশি যে বাজার সংস্কার করা হয় তাতে যৌথ কৃষি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প বাদ দেওয়া হয় বা তা থেকে শোষণ করা শুরু হয়। লোহার আর মাটির ভাতের থালা, কৃষক ও শ্রমিকরা যা লাভ করেছিলেন, দুটোকেই দুর্বল করে জনগণকে সর্বহারা করে দেওয়া হলো। গ্রামে যৌথখামারগুলি ভেঙ্গে ফেলে সেখানে পরিবারের হাতে চুক্তিপ্রথায় জমি দেওয়া হলো। জমি ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করে দেওয়া হলো— সেই জমিতে কৃষকদের ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হলো। এই সব ছোট ছোট জমির টুকরোগুলি ছিল একেবারেই ফালি ফালি ছোট, সেগুলিতে কৃষি বেশি দক্ষ হয় না, ফলে কৃষক পরিবারগুলির অবস্থান প্রান্তিক হয়ে দাঁড়ালো। হিন্টন লিখেছেন, 'আগেকার মতো ডাকটিকিটের আকারের জমি নয়, এগুলিকে বলা চলে ফিতের মতো বা নুডলের মতো জমি— এতো সরু সরু ফালি যে অনেক সময় গাড়ির একটা চাকা নিজের জমি দিয়ে চালাতে গেলে অন্য চাকাটা পাশের জমিতে চলে যায়।''

অবশ্য কোনো কোনো বামপন্থী বিশ্লেষক, যেমন জিওভান্নি আরিগি, বলেছেন যে চীনে যা হয়েছে তা হলো ''নিঃস্বকরণ না করেই সঞ্চয়''। আসলে কিন্তু বাজার-সংস্কারের সময়টা প্রথম থেকেই শুরু হয় একেবারে নিঃস্বকরণের মধ্য দিয়ে সঞ্চয়ের মাধ্যমেই, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেইসময় সর্বহারা হন। রিচার্ড ওয়াকার ও ড্যানিয়েল বাক ২০০৭ সালে *নিউ লেফ্‌ট রিভিউ*-এ বলেছেন:

> *চীনে সর্বহারাকরণের তিনটি পথ আছে: গ্রামের কৃষিজমি থেকে, শহরের ভেঙ্গে পড়া রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি থেকে, আর পূর্বতন গ্রামীণ সংস্থাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে। প্রথমটাকে ধরা যাক। গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের সংখ্যা প্রচুর। ১৯৮০ সাল থেকে ১২ কোটি মানুষ গ্রাম থেকে শহরে চলে এসেছেন— পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম। কমিউনগুলি ভেঙ্গে দিয়ে পারিবারিক দায়িত্ব প্রথা শুরু করার ফলে উন্নত এলাকাগুলিতে কোনো কোনো কৃষক ধনী হচ্ছেন, কিন্তু কৃষিপণ্যের কম দাম, খারাপ জমি, ছোট জোত, উপকরণের অভাব ও দুর্নীতির কারণে প্রান্তিক উৎপাদকরা আরো খারাপ অবস্থায় পড়েছেন।*

শহরে চলে আসা এই কৃষকদের শহরে থাকার অধিকার ছিল না। তারা পরিযায়ী শ্রমিকই থেকে গেলেন। মাও আমলে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা রোখার জন্য যে হাউসহোল্ড রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটাই এর কারণ।

নতুন মজুরি-শ্রমিক শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার দ্বিতীয় পথটি হলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলি থেকে আসা শ্রমিকরা। মাও আমলে তারা ছিল শিল্পায়নের মূল কেন্দ্র। অকৃষিপণ্যের চার-চতুর্থাংশ উৎপাদন করত তারা। বেশির ভাগই ছিল শহরে। শহরে। শহরে ৯ কোটি লোকের কর্মসংস্থান করত সেগুলি। এই ধরনের সংস্থাগুলিকে একে একে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য প্রথমে একটা আইন আনা হয়, যাতে সামাজিক সুরক্ষা ছাড়াই (অর্থাৎ লোহার ভাতের থালা ছাড়াই) অস্থায়ীভাবে

শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হলো। তারপর ১৯৮৮ সালে আনা হলো নতুন একটা দেউলিয়া আইন, যাতে শ্রমিকদের সারাজীবনের কাজের গ্যারান্টি কেড়ে নেওয়া হলো। আর ১৯৯০-এর দশকে এলো বিরাট আকারে চাকরি ছাঁটাই-এর ঘটনা। সেটা কফিনে শেষ পেরেক। নতুন শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধান সংস্থাগুলিকে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল, ৩-৪ কোটি শ্রমিক কাজ হারালেন।

শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ শহরগুলির ও গ্রামীণ সংস্থাগুলি ভেঙ্গে পড়ার ফলে সেই সংস্থাগুলিতে কর্মরত মানুষরাও মজুরি-শ্রমিকে পরিবর্তিত হলেন। উদারনীতিকরণের প্রথম পর্বে, ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় কমিউনগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার পর এটা বেশি বেশি করে ঘটেছিল। বিশেষ করে গুয়াংডং, ফুজিয়ান ও তিয়ানজিং ও সাংহাই-এর আশপাশে। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় এরকম সংস্থা ২.৫ কোটি, তারা ১০ কোটি লোকের কর্মসংস্থান করে— ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশ করে তারা। এগুলির মালিকানা ছিল স্থানীয় প্রশাসনের, তারাই এগুলি চালাতো। এগুলির খানিকটা সমাজতান্ত্রিক দায়িত্ব ছিল গ্রামের লোকদের চাকরি দেওয়ার, মজুরি ও সামাজিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার, কৃষিকে সাহায্য করার, গ্রামীণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার। এই সংস্থাগুলি অনেকক্ষেত্রে শহরের রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাবকনট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতো। সে কারণে ১৯৯০-এর দশকে যখন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি দেউলিয়া হয়ে গেল বা সেগুলি এদের চেয়ে কম দামে যোগানদার পেয়ে গেল, তখন গ্রাম-গঞ্জের এরকম অনেক সংস্থা পথে বসলো। এইসব সংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পথে বসলো। এর ফলে শ্রমিকরা দু দফায় সর্বহারা হলো। প্রথম দফায় গ্রাম-গঞ্জের সংস্থার শ্রমিক হিসাবে তারা স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব দিয়ে রক্ষিত ছিল, আর এখন তারা পুরোপুরি বাজার নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক— মার্কসের ভাষায় 'নিয়মতান্ত্রিক' ('ফর্মাল') শ্রমিক থেকে 'আসল' শ্রমিক হওয়া।

আরো সম্প্রতি, আমরা দেখবো, অনেক কৃষক বা পুরো গ্রামের ছোট ছোট জোতগুলিকেও ছিনিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছে। তার ফলে গ্রামীণ বিক্ষোভ বিরাটভাবে দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে যাওয়া এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে লুটে নেওয়ার ফলে চীনের উচ্চশ্রেণীগুলির হাতে বিশাল পরিমাণ অর্থ এসেছে। বড় বড় পুঁজিপতিরা এরকম ডাকাতি করেই অর্থ অর্জন করেছে। চীনের সবচেয়ে ধনী ২০ হাজার পরিবারের ৯০ শতাংশের বেশি সরকার বা কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চপদে ছিলেন বা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর ফলে নতুন এক শ্রেণীর কোটিপতি, কোটি-কোটিপতি, রাজপুত্র সৃষ্টি হয়েছে। এরা হলো উচ্চপদস্থদের ছেলেমেয়েরা। কৃষকদের থেকে কেড়ে নেওয়া জমি ব্যবসায়ী কাছে বিক্রি করেও স্থানীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা অপরিমেয় অর্থ অর্জন করেছেন।

বাজার-সংস্কারের মধ্যে ছিল দেঙ কথিত 'খোলা দরজা' নীতি। এতে চীন বহুজাতিক কর্পোরেশনদের অভ্যর্থনা জানায়। এটি পূর্ব-এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশের বিপরীত নীতি— ঐ দেশগুলি উন্নয়নের প্রথম দিকে শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের উপর কড়া রাশ পরিয়ে রেখেছিল। আর, ২০০৯ সালে চীন বিশ্বে বিদেশি বিনিয়োগের দিক থেকে দ্বিতীয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই স্থান তাদের। ২০০৬ সালে চীনের একটি সরকারি রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, যোগাযোগ, ক্যালকুলেটর ও ইলেকট্রনিক শিল্পে, বিদেশি পুঁজির অংশ ৮২ শতাংশ, যন্ত্রাংশ শিল্পে ৭২ শতাংশ, বস্ত্র শিল্প, জুতো ও টুপি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশ, আসবাব শিল্পে ৫১ শতাংশ, শিক্ষা ও ক্রীড়া উপকরণ শিল্পে ৬০ শতাংশ, প্লাস্টিক শিল্পে ৪১ শতাংশ, যানবাহন উপকরণ শিল্পে ৪২ শতাংশ।

এক বিশেষজ্ঞের মতে, হংকং ও অন্য দেশের মাধ্যমে পুনঃরপ্তানি বাদ দিলে ১৯৯৫-২০০৫ এই দশকে চীনের মোট রপ্তানির ৩০ শতাংশ যেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২৬ শতাংশ যেত জাপানে, আর মোটামুটি ১৬ শতাংশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে। অনেক বিশেষজ্ঞ আবার পুনঃরপ্তানির হিসেব করে দেখিয়েছেন যে চীনের রপ্তানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ আরো বেশি— ৫০ শতাংশ।

বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির বিশ্বজোড়া যোগান ব্যবস্থায় চীন মূলত ধনী দেশগুলিতে বিক্রির পণ্যগুলি জুড়বার, অ্যাসেম্বল করার, জায়গা। রপ্তানির জন্য উৎপাদন আসলে সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদন নয়, অন্যত্র উৎপাদিত অংশগুলি আমদানি করে সেগুলিকে জোড়া দিয়ে পণ্য তৈরি। এভাবে তৈরি হওয়া পণ্যগুলি এবার চীন থেকে উন্নত বিশ্বে পাঠানো হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত পণ্যের ক্ষেত্রে চীন বিশ্বের প্রধান যোগানদার। আর ২০০৬ সালে চীনের উচ্চ-প্রযুক্তির পণ্য রপ্তানির ৮৭ শতাংশ ছিল বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির হাতে। কিন্তু এই সব উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অংশগুলি যেহেতু বহুজাতিকরা বাইরে থেকে চীনে আমদানি করে, চীন থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যের দাম আর চীনে যে মূল্য সংযুক্ত হলো— দুটো এক নয়। আমেরিকার একটি ব্যাংকের হিসাব অনুসারে, "২০০৯ সালে চীনে একটি আইফোন তৈরি করতে খরচ পড়ত ১৭৯ মার্কিন ডলার, আর সেটি আমেরিকায় বিক্রি হত ৫০০ ডলারে। অর্থাৎ এই ৫০০ টাকার মধ্যে চীনের কাছে যেত ১৭৯ টাকা। কিন্তু এর মধ্যে চীনে এটি নির্মাণ (অ্যাসেম্বল) করার খরচ মাত্র ৬.৫ ডলার। বাকি টাকাটা অর্থাৎ ১৭২.৫ ডলার, হলো অন্যান্য দেশে যে সব অংশ তৈরি হয়েছে তার খরচ।

পূর্ব এশিয়ায় চীন হলো উৎপাদনের শেষ কাজটুকু করার

জায়গা, আর পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুর হলো যন্ত্রাংশ তৈরির দেশ। ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে চীনে এইসব যন্ত্রাংশের আমদানি বেড়েছে ২৪ গুণ। একই সময়ে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ১২ গুণ। ২০০৯ সালে যন্ত্রাংশের ১৭ শতাংশ আসত জাপান থেকে, ১৭ শতাংশ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে, ১৫ শতাংশ এশিয়ান-র ছয়টি দেশ (ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড) থেকে, ১০ শতাংশ ইউরোপ ও ৭ শতাংশ উত্তর আমেরিকা থেকে। তাই এটা বলা যায় না যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত পণ্যের ক্ষেত্রে চীন সবচেয়ে বড় উৎপাদক, বরং বলা চলে যে গোটা পূর্ব এশিয়া একযোগে এগুলোর সবচেয়ে বড় উৎপাদক। আর বিশ্বজোড়া যোগান ব্যবস্থাটা বহুজাতিক কর্পোরেশনের আধিপত্যাধীন, যে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি আবার মূলত ত্রিশক্তির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপান) অন্তর্ভুক্ত।

আজকের চীনা অর্থনীতি এই বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির রপ্তানির প্রয়োজন ঘিরে সংগঠিত। এই বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি দক্ষিণ গোলার্ধে আসে সেখানকার সস্তা, সুশৃঙ্খল শ্রমিকবাহিনীর সুযোগ নিয়ে শ্রম-ব্যয় কমাতে। বিশ্বজোড়া এই উৎপাদন ব্যবস্থায় চীন গোটা বিশ্বের কারখানা নয়, বিশ্বের অ্যাসেম্বলি করার জায়গা।

১৯৯৭ সালে চীনের এক বিশ্লেষক বলেছিলেন, চীন থেকে যেসব পণ্য রপ্তানি হয় তার বেশির ভাগটাই আসলে চীনে উৎপাদিত নয়, সেগুলিকে বলা চলে বিদেশি বহুজাতিকের নিয়ন্ত্রণে অনেক দেশ মিলে উৎপাদিত।

এইসব বিদেশি মালিকানাধীন চীন ও অন্যদেশ মিলে উৎপাদিত পণ্যের দরুন অর্থনৈতিক সুবিধা বেশির ভাগটাই পায় এই সব বিদেশি সাথিরা। এইসব পণ্য উৎপাদনে চীনের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে না, বরং চীনের সম্পদকে উৎপাদিকা শক্তিতে পরিবর্তিত করে বিদেশি পুঁজি মালিকদের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে। তাই এই পণ্যগুলিকে চীনে উৎপাদিত পণ্য বলা চলে না। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বে সবচেয়ে বড় দশটা শার্টের ব্র্যান্ডের মধ্যে সাতটাই তৈরি হয় বেজিং শার্ট ফ্যাক্টরিতে। কিন্তু পিয়ের কার্ডিন ব্র্যান্ডের একটি শার্টের দাম যেখানে ৩০০ ইউয়ান সেখানে শার্ট পিছু এই কারখানাটি পায় মাত্র ৩ থেকে ৪ ইউয়ান। তাহলে এই শার্টগুলিকে চীনে উৎপাদিত বলা যাবে কী ভাবে?

বিশ্ব-জোড়া যোগান ব্যবস্থার ব্যাপারটা বোঝাতে বার্বি-র উদাহরণটা নেওয়া যাক। ১৯৯৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বার্বি পুতুল বিক্রি হত ৯.৯৯ ডলারে। তাতে লেখা ছিল 'চীনে প্রস্তুত'। কিন্তু ঐ পুতুল তৈরি প্রায় সব কাঁচামাল এবং অংশগুলি প্রায় সবই চীনে আমদানি করা হয়েছিল। চীনের শ্রমিকরা শুধু সেইগুলো জুড়ে সম্পূর্ণ পুতুলটা তৈরি করে। সে সময়ে চীনে দুটো বার্বি কারখানা ছিল, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ছিল একটা করে কারখানা। চীনের প্রতিটি কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫৫০০। প্লাস্টিক আসত পেলেট বা চিপ হিসাবে। খুব সম্ভব তাইওয়ানের সরকারি রপ্তানিকারক চাইনিজ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন মারফত তা বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। নাইলনের চুল আমদানি হতো জাপান থেকে। প্যাকিং করার কার্ডবোর্ডের বাক্স, পুতুলটিকে সাজিয়ে তোলার বিভিন্ন ধরনের রং ও তেল আসত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বার্বির জামাকাপড়ের জন্য তুলো অবশ্য আসত চীন থেকেই। আর চীনা শ্রমিকের শ্রম দিয়ে এই সম্পূর্ণ পুতুলটিকে রূপ দেওয়া হতো। শ্রমিকরা প্লাস্টিকের ছাঁচের মেশিন চালিয়ে পুতুলটিকে রূপ দিতো, পুতুলটির চোখ মুখ ইত্যাদি আঁকত (আঁকা হতো ১৫টি বিভিন্ন জায়গায়), জামাকাপড় সেলাই করতো। এই শ্রমিকরা মজুরি পেত মাসে ৪০ ডলারের মতো। বার্বি পিছু মোট মজুরি পড়তো মাত্র ৩৫ সেন্ট অর্থাৎ একটি বার্বির বিক্রয়মূল্যের মাত্র ৩.৫ শতাংশ।

২০০৮ সালে চীনের ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিকরা গড়ে মজুরি পেত মার্কিন শ্রমিকদের মজুরির ৪ শতাংশ (মার্কিন ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিটিক্স)। সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো উন্নত দেশের বদলে একই প্রযুক্তিতে চীনে উৎপাদন করলে কোম্পানির বিশাল বাড়তি মুনাফা হয়। চীনা শ্রমিকরা ফক্সকন-এর জন্য আইফোন তৈরি করে, ফক্সকন আবার অ্যাপল-এর সাবকনট্রাক্ট নেয়। এই চীনা শ্রমিকরা যে মজুরি পায় তা ঐ আইফোন তৈরির মোট উৎপাদনমূল্যের মাত্র ৩.৬ শতাংশ। তাই আইফোন তৈরির উৎপাদনমূল্যের ওপর অ্যাপল যে ৬৪ শতাংশ মুনাফা করে তার পেছনে কারণ এটাই।

এই অবস্থায় কাজের ক্ষেত্রে, বিশেষত শ্রমিকরা পরিযায়ী শ্রমিক হলে, চলে অতি-শোষণ। শ্রমিকদের সেখানে যে মজুরি দেওয়া হয় তা শ্রমশক্তির মূল্যের চাইতেও কম। চীনে 'কী' কারখানায় মাইক্রোসফট ও অন্যান্য মার্কিন কারখানার জন্য পণ্য উৎপাদন করা হয়। সেখানে ১৬-১৭ বছরের শিক্ষানবিশদের কাজে লাগানো হয়, কারখানায় একটা শিফ্‌ট চলে সকাল ৭-৪৫ থেকে রাত ১০-৫৫ পর্যন্ত। শিক্ষানবিশ ছাড়াও নিযোগ করা হয় ১৮-২৫ বছর বয়সী মেয়েদের। মন্দার আগে সেখানে শ্রমিকরা সপ্তাহে ৯৭ ঘন্টা কারখানায় কাটাতো— কাজ করতো সপ্তাহে ৮০ ঘন্টার বেশি। মন্দার পর ২০০৯ সালে শ্রমিকরা কারখানায় কাটায় সপ্তাহে ৮৩ ঘন্টা আর কাজ করে সপ্তাহে ৬৮ ঘন্টা। শ্রমিকদের প্রতি শিফ্‌টে ২০০টি 'মাউস' তৈরি করতে হয়। কারখানাগুলিতে জায়গার খুব অভাব।। একটি ওয়ার্কশপ লম্বায় ১০৬ ফুট, চওড়ায় ১০৫ ফুট। তাতে ১০০০ জন শ্রমিক কাজ

করেন। মজুরি পান ঘন্টায় ৬৫ সেন্ট। তার মধ্যে কারখানার জঘন্য খাবারের দাম বাদ দিয়ে হাতে পান ঘন্টা প্রতি মাত্র ৫২ সেন্ট। শোয়ার জন্য এক একটা ডর্মিটারিতে থাকেন ১৪ জন, সরু সরু বাংকে শোয়ার ব্যবস্থা। বাথরুমটিতে ছোট ছোট প্লাস্টিকের বালতি করে গরম জল নিয়ে গিয়ে কাকস্নান করা যায়।

গুয়ানডং-এর ডনগুয়ান শহরের মিইতাই প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক কারখানায়ও একই চিত্র। দু হাজার শ্রমিক। বেশির ভাগই নারী শ্রমিক। তারা মাইক্রোসফ্‌ট, আইবিএম, হিউলেট প্যাকার্ড ও ডেল-এর জন্য যন্ত্রাংশ জুড়ে কী-বোর্ড ও কম্পিউটারের অন্যান্য অংশ তৈরি করছেন। শ্রমিকরা বয়সে তরুণ। বেশির ভাগের বয়সই তিরিশের নিচে। শক্ত টুলের ওপর বসে তার কাজ করে চলেছেন। আর অ্যাসেম্বলি লাইনে কম্পিউটারের কী-বোর্ডগুলি এগিয়ে চলেছে, প্রতি ৭.২ সেকেন্ডে একটি, ঘন্টায় ৫০০টি। প্রতিটি চাবির ঠিক জায়গায় বসানোর জন্য সময় পাওয়া যায় মাত্র ১.১ সেকেন্ড। আর একই কাজ করে চলতে হয় ঘন্টায় ৩,২৫০ বার, দিনে ৩৫,৭৫০ বার, সপ্তাহে ২,৫০,২৫০ বার, মাসে ১০ লক্ষ বারের বেশি। শ্রমিকরা এখানে সপ্তাহে সাত দিনই কাজ করেন, প্রতিদিনের শিফ্‌ট ১২ ঘন্টার। মাসে গড়ে দুদিন ছুটি মেলে। সপ্তাহে ৮১ ঘন্টা তাঁরা কারখানায় কাটান, ৭৪ ঘন্টা কাজ করেন। প্রতি ঘন্টায় মজুরি পান ৬৪ সেন্ট, খাওয়া-থাকার খরচ বাবদ টাকা কাটার পর হাতে পান ঘন্টা-প্রতি ৪১ সেন্ট। কাজের সময় অন্য শ্রমিকের সঙ্গে গল্পগাছা করলে দেড়দিনের মাইনে কাটা যেতে পারে।

মেইতাই কারখানার শ্রমিকরা সপ্তাহে চারদিন কারখানায় তালাবন্ধ থাকেন, বাইরে বেরোতে পারেন না। খাবার বলতে পাতলা চালের সুপ। প্রতি শুক্রবার অবশ্য মুরগির ঠ্যাং দেওয়া হয়। থাকার জায়গায় 'কী' কারখানার মতোই। দেওয়ালের পাশ দিয়ে লাইন করে বাংক। স্নানের জন্য ওপরতলায় জল টেনে নিয়ে যেতে হয়। মজুরি ছাড়াই তাদের কারখানা ও থাকার জায়গা পরিষ্কারের বাড়তি কাজটাও করতে হয়। কোনো শ্রমিক যদি চলার পথে ঘাসে পা দেন, তাতেও জরিমানা হয়। দেখা গেছে, শ্রমিকদের মজুরির ১৪ থেকে ১৯ শতাংশ তাঁদের ঠকিয়ে কেটে নেওয়া হয়। বলা হয় যে ''পুঁজির খরচ কমানোটা... কারখানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ''।

ডংগুয়ানের ইউওয়েই প্লাস্টিক ও হার্ডওয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি শ্রমিকদের মজুরি দেয় ঘন্টা-প্রতি ৮০ ইউয়ান। প্রতি শিফ্‌ট ১৪ ঘন্টার। সপ্তাহে সাত দিন। এ কারখানাটিতে গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। তার ৮০ শতাংশই ফোর্ড কারখানাকে বিক্রি করা হয়। পিক সিজনে শ্রমিকদের মাসে তিরিশ দিন কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ২০০৯ সালে মার্চ মাসে একজন শ্রমিক, যাকে প্রতিদিন ৩৬০০ আরটি টিউব স্টাম্প করতে হয়, প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি করে, তিনটি আঙুল হারান। কারণ, শ্রমিকদের আরো আরো দ্রুত কাজ করানোর তাগিদে কর্তৃপক্ষ ইনফ্রারেড সুরক্ষা মনিটর বন্ধ করে দিয়েছিল। শ্রমিকটিকে অবশ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। মোট ৭৪৩০ ডলার, আঙুল প্রতি ২৫০০ ডলার।

চীনের শ্রমিকদের এই অতি-শোষণের কারণ হলো বেশি মুনাফার তাগিদ, বিশেষ করে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির। জাতীয় লেবার কমিটি ও চায়না লেবার ওয়াচ-এর একটি স্টাডি থেকে দেখা যায় গেছে, ডংগুয়ানের প্ল্যান্ট এফ (এর মালিক তাইওয়ানের পউচেন গ্রুপ)-এ যে উৎপাদন হয় তার বেশির ভাগটাই জার্মান লাইফস্টাইল কর্পোরেশন পুমার জন্য। ২০০৪ সালে প্ল্যান্ট এফ-এ কর্মরত ছিলেন ৩০০০ শ্রমিক। তাঁদের বয়সের গড় ছিল ২০-২১ বছর। মজুরি ছিল ঘন্টায় ৩১ সেন্ট, সপ্তাহে ১২.৫৬ ডলার। এরা দিনে সাড়ে তেরো থেকে সাড়ে ষোল ঘন্টা কাজ করতেন, প্রতিদিন সকাল ৭-৩০ থেকে রাত ৯টা, ১১টা, এমনকি ১২টা পর্যন্ত। মাসে এক থেকে চারদিন ছুটি মিলত। ডর্মেটরির একটা ঘরে ১২ জন করে থাকতেন। রিপোর্টে দেখা যায়:

একজোড়া পুমার জুতো তৈরি করতে চীনে মজুরি বাবদ মোট ব্যয় মাত্র ১.১৬ ডলার। এই জুতো বিক্রি হয় ৭০ ডলারে। অর্থাৎ মজুরি বাবদ ব্যয় হয় জুতোর বিক্রয়মূল্যের মাত্র ১.৬৬ শতাংশ। (একজোড়া জুতো তৈরিতে সময় লাগে ২.৯৬ ঘন্টা)

অর্থাৎ প্রতি জোড়া জুতোয় কোম্পানি মুনাফা শ্রমিকের মজুরির ২৮ গুণ।

পুমা কোম্পানি চীনের প্রতিটি শ্রমিকের থেকে প্রতি ঘন্টায় ১২.২৪ ডলার মুনাফা (উদ্বৃত্ত মূল্য) আহরণ করে। প্ল্যানট এফ কারখানাটিতেই শ্রমিকদের থেকে পুমা কোম্পানির আহরিত মুনাফার পরিমাণ ৯.২ কোটি ডলারের বেশি।

ব্যবসা চালানোর সব খরচখরচা বাদ দিলেও ৭০ ডলারের এক জোড়া জুতোয় পুমা কোম্পানির নিট মুনাফাই ৭.৪২ ডলার, শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয় তার ৬.৬৪ গুণ। আর ব্যবসা চালানোর খরচাটাও তো আসে শ্রমিকদের থেকেই।

প্রতি বছরের প্রথম পাঁচ দিন দু ঘন্টায়, এক সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই চীনের শ্রমিকরা তাদের সারা বছরের বেতনের সমান উৎপাদন করে ফেলে। ২০১০ সালে সেনঝেন-এর ফক্সকন কারখানার আইফোন আর আইপ্যাড উৎপাদনকারী ১৮ থেকে ২৫ বছরের ১৮ জন শ্রমিক আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ১৪ জন মারা যান আর ৪ জন জন্মের মতো পঙ্গু হয়ে যান। এর ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে একটা গোলযোগ ওঠে। এই শ্রমিকদের কাজের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বিশ্বের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

চীনে যদিও নিম্নতম মজুরির আইন আছে, আছে নানা শ্রম আইন, বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করে অনিয়ন্ত্রিত অসংগঠিত ক্ষেত্রে, সেখানে কোনও নিম্নতম মজুরি নেই, আর শ্রমিকদের মজুরির একটা অংশ আটকে রাখা হয়। অনিতা চান বলেছেন (২০০১), নিম্নতম মজুরিটি একেবারেই নিম্নতম মূল্যে

স্থির করা, তাতে শ্রমিকরা কোনোমতে বেঁচে থাকতে পারেন। অথচ সেটুকুও শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে না। এর পর আছে মজুরি কাটা। লাইট নেভাতে ভুল করা, বা ঘাসের ওপর হাঁটা, কিংবা বাসস্থান নোংরা রাখা, কাজের সময় অন্যদের সঙ্গে কথা বলার জন্যও টাকা কেটে নেওয়া হয়। গুয়ানডং-এর ট্রেড ইউনিয়নগুলির করা একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে শ্রমিকদের ৩২ শতাংশই আইনি নিম্নতম মজুরির চেয়ে কম মজুরি পাচ্ছেন।

বিশ্বজোড়া এই ব্যবস্থাটির পেছনে আছে সাম্রাজ্যবাদী খাজনা আদায়ের একটা ব্যবস্থা, বিশ্বজোড়া একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির মুনাফা আসে এই ব্যবস্থা থেকে। চীনের এই অনন্যসাধারণ প্রবৃদ্ধি আসলে বিশ্বজোড়া শোষণ ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা থেকেই সৃষ্ট। বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রে থাকা সংস্থাগুলিই এই ব্যবস্থার মূল সুবিধা লাভ করে।

ভাসমান জনতা

চীনে শ্রমশক্তির যে প্রচণ্ড শোষণ চলছে সেটা বুঝতে হলে, এর সঙ্গে জড়িত বিশেষ শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলিকে বুঝতে হলে, 'ভাসমান জনতা'র ভূমিকা লক্ষ্য করা দরকার। ১৯৫৫-৫৮ সালে যে পারিবারিক নথিকরণ করা হয়েছিল তাতে প্রতিজনকে তার জন্মস্থানে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এর ফলে দেশের মধ্যে পরিযায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে একটা বাধা পড়ে। যারা তাদের নথিকরণের এলাকার বাইরে থাকে তারা হলো ভাসমান জনতা। বর্তমানে তাদের সংখ্যা ২২ কোটি। এদের মধ্যে ১৬ কোটি গ্রামীণ মানুষ, যারা নিজেদের জন্মস্থানের বাইরে বাস করছেন। ম্যানুফাকচারিং শিল্পের ৭০ শতাংশ আর নির্মাণ শিল্পে ৮০ শতাংশ শ্রমিক গ্রামীণ এই ভাসমান মানুষ। এরা শহরের সবচেয়ে নিচু কাজগুলি করেন আর মজুরি পান শহরের গড় মজুরির চেয়ে অনেক কম। কাজ করেন অনেক সময় দেড় গুণ বেশি সময়। ২০১১ সালে বেজিংয়ের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ছিলেন এই সাময়িক বাসস্থানের এই পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরা বেজিংয়ের সাময়িক বাসিন্দা। সেনঝেন শহরের ১.৪ কোটি বাসিন্দার মধ্যে ১.২ কোটিই গ্রামীণ পরিযায়ী মানুষ। এরা মজুরি পায় কম, তার ওপর শহুরে শ্রমিকদের মতো বিভিন্ন সুযোগসুবিধাও তারা পায় না। এদের বেশির ভাগের বয়স ৩৫-এর কম। ২০০৪ সালে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের বয়সের গড় ছিল আঠাশ। এরা কয়েক বছর শিল্পকেন্দ্রে বাস করেন অতি-শোষণের মধ্যে (শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন ব্যয়ের চেয়েও কম মজুরি পান তাঁরা) আর তারপর ঘরে কৃষকের জীবনে ফিরে যান।

ভয়াবহ অবস্থায় অতি দীর্ঘ সময় কাজ করার ফলে বিশেষত এইসব গ্রামীণ পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়ে। তা প্রকাশিত হয় শিল্প দুর্ঘটনা হিসেবে। সরকারি হিসেবে ২০১০ সালে চীনে ৩৬৩৩৮৩টি বড়সড় শিল্প দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তাতে ৭৯৫৫২ জনের মৃত্যু ঘটেছিল। অবস্থাটা অবশ্য ২০০৩ সালের চেয়ে অনেকটাই ভালো। সেবছর শিল্প দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৭ লক্ষ আর তাতে মৃত্যু ঘটেছিল ১,৩০,০০০। এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক।

অনেক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ চীনের পরিযায়ী শ্রমিকদের ধরেন সাধারণভাবে গ্রামের উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের শহরে চলে আসা হিসাবে। কিন্তু চীনে এই শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত হওয়ার ব্যাপারটা বেশ অন্য ধরনের। চীনের এই ভাসমান জনতাকে এক অর্থে মার্কসীয় অর্থে শ্রমের উদ্বৃত্ত বাহিনী বলা চলে, কিন্তু একটা তফাতও আছে। তফাতটা এই যে এই সর্বহারাকরণ ঘটে সাময়িকভাবে, আংশিকভাবে। তাছাড়া এই সর্বহারাদের গ্রামের জমির সঙ্গে একটা স্থায়ী সম্পর্ক থেকে যায়। কৃষকদের জমি ব্যবহারের অধিকার রয়ে গেছে, কয়েক বছর পর পর মোটামুটি সমতার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করা হয়। সেখানে তাদের পেশা ও জমিতে কাজ করার হিসাব নেওয়া হয়। এর ফলে গ্রামীণ এইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা স্বার্থ থেকে যায় গ্রামে তাদের পরিবারের সঙ্গে, জমির সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে দেওয়ার। কৃষকদের এই অতি ক্ষুদ্র জোত, গড়ে যার পরিমাণ ১.২ একর, যদিও অনেক সময় তা এমনকি এক একরের এক-অষ্টমাংশ পর্যন্ত হতে পারে— তা দিয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করা চলতে পারে। মাথার ওপর ছাদ আর পেট ভরানোর জন্য খাবারটুকু জুটে যায়। বাজারি সংস্কার এই জমিগুলোকেও ভাঙতে চেয়েছে, কিন্তু প্রায় কোনো পরিবারই তাদের এই 'মাটির তৈরি ভাতের থালা' হারাতে চায়নি। জমিতে তাদের অধিকার তারা ব্যবহার করে। কিন্তু অবস্থা ভালো করতে হলে কৃষক পরিবারগুলোকে অকৃষি কাজ করে তাদের সামান্য আয়টুকু বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হয়। এর ফলেই দেখা দিয়েছে গ্রামীণ পরিযায়ী শ্রমিক। বাজারি সংস্কারের ফলে গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধা কমে যাওয়ায় এ ব্যাপারটা আরও বেড়েছে।

গ্রামীণ এই পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের পরিবারের কাছে টাকা পাঠায়। আয়ের একটা অংশ অন্তত তারা সঞ্চয় করে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। শহরে স্থায়ীভাবে থাকার বাধা তো আছেই, তা ছাড়াও গ্রামের সঙ্গে, জমির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র থেকে যায় বলে, একটা সুরক্ষাবোধ কাজ করে বলে, তারা গ্রামে ফিরতে চায়। জমিকে মনে করা হয় একটা স্থায়ী সম্পদ, যা উত্তরপুরুষের জন্য রেখে যাওয়া যায়। ২০০৬ সালের একটি সরকারি সমীক্ষায় দেখা গেছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের মাত্র ৮ শতাংশ দীর্ঘস্থায়ীভাবে শহরে থেকে যাওয়ার কথা বলেছে।। ২০০২ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মাত্র ৫ শতাংশ শ্রমিক সেবছর 'দেশে' যান নি, অন্যদিকে, ৬০ শতাংশ নয় মাসের বেশি গ্রামের বাইরে থাকেন নি। অর্থনীতিতে যখন ভাটার টান দেখা দেয় তখন গ্রামের দিকে ফেরাটা একটা কুশনের কাজ করে। ২০০৭-০৯-এর আর্থিক সংকটের সময় চীনের রপ্তানি

যখন দারুন কমে গিয়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও তখন অনেক কমে গিয়েছিল (১.৪ থেকে ১.৮ কোটি)। কারণ, গ্রামীণ পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ না পেয়ে গ্রামে জমির কাজে ফিরে যায়। শহর অভিমুখে নতুন অভিবাসনও কমে যায়। এই ফিরতি অভিবাসনের ফলে বেকারি কম হয়। এতটাই যে ঐ সংকটের সময় মজুরি কমার বদলে বেড়ে গেছিল, পরিযায়ী শ্রমিকের অভাবে শিল্পে শ্রমিক স্বল্পতার জন্য ও খাদ্যের দাম বাড়ার ফলে।

এই গ্রামীণ পরিযায়ীবৃত্তি কীভাবে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির বাইরে গ্রামাঞ্চলে উচ্চমানের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদন করছে, সেটা নিয়ে কোনো কোনো বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন। এই পুনরুৎরাদিত শ্রম আবার ভাসমান অবস্থায় শহরে অতি-শোষণের জন্য পাওয়া যায়। অথচ এই শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের খরচ শহরের শিল্পকে বহন করতে হয় না। ফলে শিল্পের ব্যয় কমে, উৎপাদনশীলতা বাড়ে, কারণ এই শ্রমিকরা বয়সে নবীন, তাদের অনেক বেশি কাজ করানো যায়, আর তারপর তারা গ্রামে ফিরে যাবে, বদলে আসবে আবার নতুন নবীন শ্রমিকের দল। সপ্তাহে ৮০ ঘন্টার বেশি কাজ, দ্রুতগতিতে কাজ, খারাপ খাবার, খারাপ বাসস্থান— এই হলো কাজের জায়গার অবস্থা, আর তার বিনিময়ে যে মজুরি তাতে এই শ্রমিকদের বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। এই অবস্থাটা চলতে পারে কারণ শ্রমিকরা গ্রামে ফিরে যেতে পারে, যেখানে জমির ওপর তাদের অধিকার আছে। যে অধিকার চীনের বেশির ভাগ মানুষের কাছে চীন বিপ্লবের দান। তা সত্ত্বেও, গ্রাম ও শহরে আয়ের ফারাক এমনই যে বেশিরভাগ পরিবারই শুধু কৃষিকাজ করে ভালোভাবে বাঁচতে পারেন না, আর গ্রামাঞ্চলে অন্য কাজের সুযোগও নেই। সে কারণে এই ভাসমান শ্রমিক জনতা থেকেই যায়। প্রতিদিন নতুন নতুন পরিযায়ী শ্রমিক তাতে যোগ দেয়।

জমি, শ্রম ও পরিবেশগত সংগ্রাম

গ্রামীণ কৃষকদের জমি ব্যবহারের অধিকার থেকে যায় বলে কিছু কিছু বামপন্থী বিশ্লেষক মনে করেন যে চীনে 'নিঃস্বতা ছাড়াই সঞ্চয়' চলছে। আমাদের মতে চীন কিন্তু সাধারণ ধারার খুব একটা বাইরে নয়। আদিম সঞ্চয় অর্থাৎ জনগণের কাছ থেকে তাদের সম্পদ, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কেড়ে না নিলে এত দ্রুত পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। ১৯৯০-এর দশকে *বিরাট বিপরীত যাত্রা* গ্রন্থে হিন্টন বলেছিলেন যে চীনে আদিম সঞ্চয় ঘটাতে গেলে চীনা বিপ্লবে জনগণের প্রধান অর্জন 'মাটির তৈরি ভাতের থালা' ও 'লোহার তৈরি ভাতের থালা'-কে দুর্বল করতে হবে, ভেঙ্গে দিতে হবে। এই দুই ধরনের 'ভাতের থালা'ই এখন আক্রমণের শিকার হয়েছে। এর ফলে এবং এর পাশাপাশি শ্রমিকদের উপর শোষণ ও অসাম্য বাড়ার ফলে শ্রমিক ও কৃষকের প্রতিবাদও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

চীনে এই ধরনের বড় বড় গণ-বিক্ষোভের ঘটনা (আবেদন, ধরনা, ধর্মঘট ও দাঙ্গা) ২০০৫ সালে যেখানে ছিল ৮৭ হাজার, ২০১০ সালে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৮০ হাজারে। এইসব সংঘাতের দুটো প্রধান কারণ হলো : (১) জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে বেআইনি জমি অধিগ্রহণ, যাকে মাটির ভাতের থালার ওপর আক্রমণ বলে মনে করা হয়; (২) শ্রম বিরোধ বিশেষ করে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে অর্থাৎ লোহার ভাতের থালা ভাঙ্গার চেষ্টার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সংস্থার শ্রমিকদের প্রতিরোধ। এছাড়াও আছে পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম।

২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে গুয়ানডঙের সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রাম যুকানে ২০,০০০ মানুষ রাস্তা বন্ধ করে, সরকারি প্রতিনিধিদের তাড়া করে বিক্ষোভ শুরু করেন। সামান্য পয়সার বিনিময়ে বা বিনি পয়সায় জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তাঁরা দেশি অস্ত্রশস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করছিলেন। স্থানীয় সরকারের সঙ্গে দশ দিন ধরে টক্কর দেওয়ার পর কিছু দাবি মিটিলে তবেই গ্রামবাসীরা তাঁদের প্রতিবাদের অবসান ঘটান, গ্রামের রাস্তা আবার খুলে দেন।

এসব ঘটনা থেকে আজ চীনে কী ধরনের সংগ্রাম চলছে বোঝা যায়। এসব ঘটনা ''কমিউনিস্ট বিপ্লবের একটি মূল নীতিকে উল্টে দেওয়ার বার্তা দেয়। ধনী জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে সেই জমি নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে মাও জনগণের মন জিতে নিয়েছিলেন। আর এখন ক্ষমতাশালী স্থানীয় সরকারি আমলারা সেই জমি কেড়ে নিচ্ছে, কখনো কখনো জোর করে, যাতে করে সেই জমিতে সেই জমিতে ঋণের ভিত্তিতে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট, মল, স্পোর্টস কমপ্লেক্স ইত্যাদি গড়ে ওঠে।'' (*ব্লুমবার্গ বিজনেসউইক*) রাজ্য স্তরের, কাউন্টি স্তরের ও শহরের স্থানীয় সরকারগুলি ২০০৯ সালের শেষ পর্যন্ত ২৭৯,০০০ কোটি ইউয়ান (৪১,২০০ কোটি ডলার) ঋণ করেছে, সেই টাকায় তারা বিরাট সংকটে আর্থিক উৎসাহ দিয়ে সংকট কাটাতে চায়। গ্রামবাসীদের জমি দেখিয়ে, তার ভিত্তিতে তারা এই ঋণ নিয়েছে। এই জমি বেচে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা। তাই বলা চলে, শহরগুলো তাদের ক্রমবর্ধমান ঋণের চাহিদা মেটাতে জমি গ্রাস করছে।

ভূসম্পত্তির (রিয়াল এস্টেট) দাম কমায় এই প্রক্রিয়াটি আরো জোরদার হয়েছে। কারণ স্থানীয় সরকারগুলো করের টাকা তেমন পায় না, তাদের আরো বেশি জমি বেচার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। স্থানীয় সরকারগুলির রাজস্বের ৩০ শতাংশই এখন আসে জমি বেচা থেকে। জমি বেচায় গ্রামবাসীদের সমর্থন নেই। জমি বেচলে তাদের ক্ষতি। কারণ এইসব জমি তাদের যৌথ সম্পদ, এগুলিতে ছোট ছোট জোত বানিয়ে তারা চাষের অধিকার প্রয়োগ করতো। অন্যদিকে এই জমি বেচার টাকাটা

পকেট ভরাবে স্থানীয় সরকারি বাবুদের। কৃষকরা যে শুধু তাদের জমি খোয়াবে, তাদের মাটির ভাতের থালা খোয়াবে তাই নয়, এই জমির দরুন তাদের যে দাম দেওয়া হচ্ছে তা জমি-বেচা দামের চেয়ে অনেক কম। গত তিন দশকে ৫ কোটি কৃষক গৃহহারা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, আগামী দুই দশকে আরো ৬ কোটি কৃষককে গৃহহারা হতে হবে।

শ্রম বিরোধ এখনো গণ-প্রতিবাদের সবচেয়ে প্রধান কারণ। এ ধরনের সমস্ত ঘটনার ৪৫ শতাংশ শ্রম বিরোধ ঘটিত। ২০১০ সালের গ্রীষ্মে চীনের অটো শিল্প, ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও কাপড় শিল্পে ডজনে ডজনে স্ট্রাইক ঘটেছে। বেসরকারিকরণের চোটে চীনে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা কমে এসেছে, কিন্তু এখনো তারা শহরাঞ্চলে ৬ কোটি লোকের কর্মসংস্থান করে।

মিনকি লি লিখেছেন, ‘‘মাওবাদী সমাজতন্ত্রী জমানায় চীনের (রাষ্ট্রীয়) শ্রমিকরা শ্রেণী ক্ষমতা ও সম্মানের এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিলেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাধারণ শ্রমিকের পক্ষে যা অকল্পনীয়। বাজারি সংস্কারের পর এই শ্রমিকরা দিন দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সর্বহারায় পর্যবসিত হচ্ছেন, তবে শ্রমিকরা যেখানে শক্তিশালী সেখানে তাঁদের কাছে লোহার ভাতের থালার অবশিষ্টাংশটা আছে। এর ফলে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম চলছে। ২০০৯ সালে জিলিন রাজ্যের টঙ্গুয়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা বেসরকারিকরণ ও ব্যাপক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মাওবাদী জমানার শ্রমিক মাস্টার য়ু-র নেতৃত্বে তারা সাধারণ ধর্মঘট করেন। শক্তিশালী একটি প্রাইভেট কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার যখন সংস্থাটির অধিগ্রহণের মুখে ভয় দেখায় যে তারা সব শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেবে, শ্রমিকরা তখন তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এর পর সরকার পিছু হটে, বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

জমি নিয়ে বিরোধ ও শ্রম বিরোধের পর চীনে সংঘাতের আর একটা জায়গা হলো পরিবেশ সংক্রান্ত, বিশেষ করে দূষণ নিয়ে সংগ্রাম। চীনের পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা বিশাল। সমস্যাটি দিন দিন বাড়ছে। বিশ্বের সবচেয়ে দূষণযুক্ত কুড়িটি শহরের মধ্যে ষোলটিই চীনে। গত দশকে চীনে ফুসফুসে ক্যান্সার ৬০ শতাংশ বেড়ে গেছে, যদিও ধূমপানের হার বাড়ে নি। মরুকরণের ফলে প্রতিবছর ৬০০০ বর্গ মাইল ঘাসজমি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। ফলে বালুঝড় বাড়ছে। চীনের বায়ুদূষণ সংক্রান্ত সমস্যার এক-তৃতীয়াংশ এখন ধুলো নিয়ে। জল সমস্যা ও জল দূষণ সমস্যা দুইই বাড়ছে। পৃথিবীর মোট মিষ্টি জলের মাত্র ৬ শতাংশ চীনে, যদিও জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশরও বেশি। ফলে এদেশে জনপ্রতি মিষ্টি জলের পরিমাণ বিশ্বের গড়ের এক চতুর্থাংশ। অন্যদিকে এদেশের নদী ও হ্রদগুলি দারুন দূষণগ্রস্ত। গ্রামাঞ্চলের ৩০ কোটি মানুষ অ-নিরাপদ জল পান করছে। বড় বড় শহরে এক-পঞ্চমাংশ পানীয় জলের নিম্নমানের। ২০০৮ সালে গ্রীনহাউস গ্যাস উৎপাদনে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাপিয়ে গেছে (অবশ্য জনপ্রতি গ্যাস উৎপাদন এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক কম)। এসবের ফলে পরিবেশ নিয়ে গণবিক্ষোভ বাড়ছে। ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে এ নিয়ে নালিশের সংখ্যা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সালে নালিশের সংখ্যা বছরে ৬ লক্ষ, যদিও সরকারিভাবে সংখ্যাটা ৫০ হাজার।

চীনের উৎপাদক শক্তির মধ্যে একটা বড় অংশ, আগেই বলেছি, ভাসমান এক জনতা, যারা একদিকে জমির সঙ্গে যুক্ত, জমিতে চাষের অধিকার আছে তাদের (মাটির ভাতের থালা), পাশাপাশি তারা শহরে ভয়ানক শোষণের শিকার, পরিবেশগত সমস্যার শিকার। এর ফলে জমি নিয়ে, শ্রম নিয়ে, ও পরিবেশ নিয়ে সংগ্রাম চীনে বড় বেশি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। হয়ত এদেশে আমরা পরিবেশগত সর্বহারা শ্রেণীর জন্ম দেখব। পাশাপাশি থাকবে আংশিক সর্বহারা, তুলনামূলকভাবে স্বাধীন এবং সম-চরিত্রের কৃষকরা।

সামির আমিন যেমন বলেছেন, চীনের গ্রাম থেকে কোটি কোটি মানুষকে কাজ দিতে চীনের শহরগুলি সক্ষম নয়। (বিশ্বের দক্ষিণের বিভিন্ন দেশেই এটা একটা সমস্যা) তাই এদেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশকে গ্রামেই থেকে যেতে হবে। শিল্পায়নের সময় ইউরোপ বাইরে কলোনি তৈরি করে গ্রামের বাড়তি জনসংখ্যাকে যেভাবে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিল, চীনের ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই।

বিপ্লবের ফলে চীনে একটা স্বাধীন কৃষকবাহিনী তৈরি হয়েছিল, সাম্যভিত্তিক ভূমি বণ্টনের ফলে যারা বিশ্বের ২২ শতাংশ মানুষকে খাওয়ায়, যদিও বিশ্বের চাষযোগ্য জমির মাত্র ৭ শতাংশ এদেশে। তাদেরকে পুরনো একটা সমস্যা যার থেকে আদিম সঞ্চয় করে যেতে হবে, এভাবে না দেখে চীনা সমাজের শক্তি হিসাবে দেখা যেতে পারে। এর অর্থ, মানবসমাজের অর্ধেকেরই জমির সত্যিকারের প্রয়োজন রয়েছে।

চীন ও বিশ্ব সংকট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (এবং কানাডা), ইউরোপ ও জাপানে অর্থনৈতিক স্থবিরতা চলছে। বিশাল আর্থিক সংকট একে আরো জোরদার করে তুলেছে। বিশ্ব অর্থনীতিকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য জোর পড়ছে চীনের ওপর। চীন কি বিশ্বের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হতে পারে— *জার্নাল অফ ইন্টারন্যাশনাল ইকনমি*-র ২০১০ সালের শীত সংখ্যায় এই বিষয়ে ৫০ জন প্রাচীনপন্থী (অর্থোডক্স) অর্থনীতিবিদের বক্তব্য ছাপা হলো। বক্তব্যগুলো বিভিন্ন। কিন্তু বেশির ভাগ অর্থনীতিবিদই চীনের অর্থনীতির ভিতরের দ্বন্দ্বগুলির উপর জোর দেন, অতিবিনিয়োগের প্রবণতা ও রপ্তানির ওপর অতি-নির্ভরতার কথা বলেন, ভোগের কম মাত্রার কথা বলেন, জানান যে এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য আনা দরকার।

সম্প্রতি চিন্তা দেখা দিয়েছে যে চীন যদি ভোগ বাড়াতে না পারে, ঋণ কমাতে না পারে, চীনের অর্থনীতির এই দ্বন্দ্বগুলি সারা বিশ্বের সঞ্চয় প্রক্রিয়াকে আরো বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। চীনের অর্থনৈতিক ম্যাজিকের দিন ফুরিয়ে আসতে চলেছে, চীনের প্রবৃদ্ধি দ্রুত কমতে চলেছে, সেখানে আর্থিক সংকট আসতে চলেছে— এই দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

২০১১ স্যালে নিউইয়র্ক টাইমসে পল ক্রুগনান লিখেছেন:

> এরকম একটা চিত্র কল্পনা করুন: সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে আছে নির্মাণ শিল্পের জোয়ারের ওপর, যে জোয়ার নির্ভর করে আছে রিয়াল এস্টেটের মূল্যবৃদ্ধির ওপর। বুদবুদের সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এই প্রবৃদ্ধিতে। ঋণ দারুন বেড়েছে। কিন্তু তা ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে হয় নি, হয়েছে ছায়া-ব্যাংকিং-এর পথে। এই ছায়া-ব্যাংকিংয়ে সরকারি নজরদারিও নেই, সরকারি গ্যারান্টিও নেই। এখন সেই বুদবুদ ফাটছে—আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকটের ভীতির কারণ আছে।

এটা কি ১৯৮০-র দশকের জাপানের বর্ণনা? নাকি ২০০৭ সালের আমেরিকার? তা হতেই পারত। তবে আসলে এখানে বলা হচ্ছে চীনের কথা। চীন এখন বিশ্ব অর্থনীতির আর একটি বিপজ্জনক অঞ্চল... সংকটের আর এক কেন্দ্র।

কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দ্বন্দ্ব কতটা তীব্র সেটা মূলধারার বিশ্লেষকরা প্রায় কেউই ধরতে পারছেন। এই দ্বন্দ্বগুলি চীনের বিকাশের বর্তমান ধরনটিকে টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাধা। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ গণ বিক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে এই দ্বন্দ্বগুলি। জমির অধিকার বজায় রাখার জন্য কৃষকরা সংগ্রাম করছেন। ভাসমান জনতা (যারা এখনো জমির সঙ্গে যুক্ত) অতি-শোষণের বিরোধিতা করছেন। রাষ্ট্রীয় সংস্থার শ্রমিকরা বেসরকারিকরণ রুখছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যেকার সংগ্রামের কথা বলা হয় তাতে দেশটির মধ্যে শ্রেণী অসাম্য বাড়ার কাহিনীটি গোপন করে যায়। একদিকে রাষ্ট্রের আমলাদের হাতে সোনার থালা এতো বেড়ে গেছে যে শক্তিশালী পার্টি সদস্যরা কোটি কোটি ডলার সম্পদের মালিক হয়ে উঠছেন। যেমন, চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও-এর সম্পদের পরিমাণ ৪৫০ কোটি ডলার। অন্যদিকে, শ্রমিকদের মজুরি বিশ্বের সর্বনিম্ন মজুরি মধ্যে পড়ে। অসাম্য দিন দিন রকেটের বেগে বাড়ছে।

চীনে কম মজুরির ভিত্তিতে যে রপ্তানি চলছে তার প্রায় পুরোটাই স্থায়ী ভোগ্যপণ্য। মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ সংক্রান্ত বা ইলেকট্রনিক পণ্য, এছাড়া জামাকাপড়, আসবাব, খেলনা ও গৃহস্থালি নানা দ্রব্য। ২০১০ সালে 'চীনে উৎপাদিত' পণ্যগুলি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রিত আসবাব ও গৃহস্থালি সরঞ্জামের ২০ শতাংশ, অন্যান্য স্থায়ী ভোগপণ্যের ১২ শতাংশ, জামাকাপড় ও জুতোর ৩৬ শতাংশ। চীন থেকে আমদানিকৃত এইসব পণ্যকে বলা হয় 'ডিফ্লেশনারি' পণ্য, কারণ এগুলি মজুরি দিয়ে কেনা পণ্যসমূহের দাম কমিয়ে রাখে আর তার ফলে পেট্রোলের মতো ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ার চাপ নেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়। ওয়ালমার্ট, চীন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হওয়া পণ্যের ১২ শতাংশ যাদের মাধ্যমে আসে, সেই ওয়ালমার্টকে বলা হয়েছে মার্কিন শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বড় বন্ধু। ওয়ালমার্টে পণ্যের দাম কম। ''গরিব লোকের জন্য সবচেয়ে ভালো যা ঘটেছে তা হলো ওয়ালমার্ট''। আবার উল্টোদিকে ওয়ালমার্টে যে কম দামের আমদানিকৃত পণ্য আসে তার ফলেই আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কিছু দেশে মজুরি কমে যাচ্ছে। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কর্মসংস্থান বিশ্বের দক্ষিণে চলে যাওয়ার ফলে উন্নত বিশ্বে মজুরি কমছে, প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে (বেশি মজুরির চাকরিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে)।

সস্তার ভোগপণ্যের আমদানি এভাবে বাড়ার ফলে মার্কিন দেশের অনেক শ্রমিক গোষ্ঠী এর থেকে রেহাই পাওয়ার কথা বলছে। কিন্তু এই সব সস্তার ভোগ্যপণ্যের উৎপাদক যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলিই, যাদের কেন্দ্র আবার উন্নত বিশ্বেই, সে কথাটা বিশেষ আলোচনা হয় না। তাই অতি-শোষণ আক্রান্ত চীনের শ্রমিকদের সঙ্গে উন্নত বিশ্বের শ্রমিকদের, যাদের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে চলেছে, তাদের আন্তর্জাতিক সংহতি তৈরি করাটাই আজকের আসল সংগ্রাম। এরকম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির ভিত্তি তৈরি পাওয়া যাবে চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রামের মধ্যে। চীনে বিপ্লবী প্রক্রিয়া আবার শুরু হলে এটি আরো জোরদার হবে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে, 'মাও-এর ফিরে আসা বা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ' ছাড়া চীনের বর্তমান গতি রোধ করা অসম্ভব। কিন্তু মাও-এর ফিরে আসা মানে তো চীন বিপ্লবের পুনর্জন্ম, যা পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নেবে- সে সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্ভাবনা দিন দিন বাড়ছে।

১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস বলেছিলেন যে সেসময়ের চীনা বিপ্লব (বিখ্যাত তাইপিং বিদ্রোহ) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থাকে নড়বড়ে করে দিতে পারে, ইউরোপে বিদ্রোহের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে। মার্কসের সেই আশা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু চীনের আর পশ্চিমের ভাগ্য যে একই সুতোয় বাঁধা সেই বক্তব্যটির মধ্যে দূরদর্শিতা আছে। চীনের দ্বন্দ্ব যত গভীর হবে, ত্রিশক্তির ওপর, বিশ্বের ওপর, পুঁজিবাদের পতনের ওপর, তার প্রভাব পড়বেই।

(মান্থলি রিভিউ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে গৃহীত,
স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, ঈষৎ সংক্ষেপিত)

মতামত

প্রসঙ্গ: 'ভারতে 'মাওবাদ'

হর্ষ ঠাকোর

❑ হর্ষ ঠাকোর মার্কসবাদী প্রাবন্ধিক, মূলত রাজনীতি ও মতাদর্শগত বিষয়বস্তুর উপর লেখেন, তবে বাংলা জানেন না। অনীক-এর *ভারতে 'মাওবাদ'* (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর : ২০১০) বিশেষ সংখ্যাটির খোঁজ পেয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। আমরা সংখ্যাটি তাঁকে পাঠিয়ে দিই, তৎসহ ওই সংখ্যার মূল ইংরাজি লেখাগুলি ও প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধের ইংরাজী সার-সংক্ষেপ। তিনি নিজেও তাঁর একজন বাংলা-জানা বন্ধুর সহযোগিতায় সেগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে অবহিত হন। যেহেতু ইতিমধ্যে প্রায় দু'বছর পার হয়ে গেছে, তাই তিনি কোনো বিতর্কের অবতারণা করার বদলে, তাঁর ধারণামতো, ওই সংখ্যায় প্রাসঙ্গিক আরও যে সব তথ্য থাকা দরকার ছিল, সেগুলি সম্প্রতি 'সংযোজন' হিসেবে, সে-সম্পর্কে প্রাথমিক মূল্যায়ন-সহ এই লেখাটি পাঠিয়েছেন। আমরা সেটি ঈষৎ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করছি— *সম্পাদকমণ্ডলী, অনীক* ❑

১। ১৯৭৭-পরবর্তীকালে পিডব্লুজি, পিপলস্ ওয়ার, পার্টি ইউনিটি ও এমসিসি-র গণ-সংগ্রাম।

ক) অন্ধ্র প্রদেশ এবং দণ্ডকারণ্য

নকশালবাড়ী আন্দোলনের চারু মজুমদার পর্বের গণ-সংগ্রাম এবং গণ-সংগঠন বর্জনের ত্রুটি সংশোধন করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য কমিটি (১৯৮০ সালে সিপিআইএমএল-পিপলস ওয়ার) সাময়িকভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম স্থগিত রাখে এবং কৃষক আন্দোলন সহ বিভিন্ন গণ-সংগঠনগুলিকে ও গণ-আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে। এব্যাপারে ছাত্রসংগঠন এপিআরএসইউ-ও (Andhra Pradesh Radical Students Union) বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

কৃষক আন্দোলনের পুনর্জাগরণ

শুধুমাত্র স্থানীয় দাবিতে নয়, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে, ভূয়া 'সংঘর্ষের' বিরুদ্ধে, পুলিশ লকআপে নির্যাতন এবং পুলিশ-ক্যাম্প অপসারণের দাবিতে ১৯৭৭-এর শেষদিকে সমস্ত জেলা জুড়ে কৃষকদের বিশাল মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে কৃষক এবং কৃষিমজুরদের সংগঠন রূপ নিতে শুরু করে। ১৯৭৭-এর নভেম্বরে জমিদাররা সিরসিলা তালুকের লক্ষ্মী রাজম এবং জোগিতাল তালুকের পট্টা পসেটিকে খুন করে। পরের গ্রীষ্মে ছাত্র সংগঠনগুলির গ্রামাঞ্চলে প্রচার কৃষক আন্দোলনে ব্যাপক উৎসাহ সঞ্চার করে এবং আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। যে গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলির ভিত্তিতে তাঁরা সমবেত হতে শুরু করেন, সেগুলি হলো: কৃষিমজুরদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, স্থায়ী খামার শ্রমিকদের মাসিক ও বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, প্রচলিত বেগারি প্রথা এবং জমিদারদের নগদে ও দ্রব্যে নজরানা দেবার প্রচলিত প্রথার অবসান, উৎকোচ প্রত্যর্পণ, জমিদারদের দখলে থাকা সরকারি খাস জমিগুলি দখল, পতিত জমি দখল, সরকারি বনভূমিতে জমিদারদের দ্বারা উৎপাদিত জ্বালানি এবং কাঠ বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি। কৃষিমজুরদের ধর্মঘট গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। জমিদারদের সশরীরে জনসমাবেশে ধরে আনা হতো এবং তাদের অপরাধগুলি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং অবৈধভাবে নেওয়া জুলুমবাজির অর্থ ফেরত দিতে বলা হতো। কৃষকদের বিশাল মিছিল পতিত জমি এবং জমিদারদের দখলে থাকা সরকারি খাস জমি দখল করতো। করিমনগর ও আদিলাবাদের অনেক তালুকে বিড়ি-পাতা সংগ্রাহক শ্রমিকদের ধর্মঘটেও গতিবেগ সঞ্চারিত হতে শুরু করে। এই সময়কার সবথেকে কার্যকর এবং জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল জমিদার ও তাদের অনুচরদের 'সামাজিকভাবে একঘরে করে দেওয়া'। কোন একজন জমিদারকে একঘরে করা হলে পুরো গ্রামটাই তার সঙ্গে সমস্তরকম আদান-প্রদান এবং কাজকর্ম বন্ধ করে দিত। পরবর্তী-কালে গ্রামে থানা-গাড়া পুলিশের বিরুদ্ধেও এই আন্দোলন জারি করা হয়েছিল।

এই সময়কার অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কৃষকদের দ্বারা পঞ্চায়েতগুলি দখল এবং বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে পঞ্চায়েত এক ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান। ছোটোখাটো বিরোধগুলি এখানে জনসমক্ষেই জমিদারবাবুদের খেয়ালখুশিমতো বিচার হতো। এখন, তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে বিপ্লবী কৃষকরা পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব নিল। এবং জমিদাররাও বিচারের সম্মুখীন হলো।

পুলিশের দমন-পীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হতেই থাকে। জোগিতাল শহরের ঐতিহাসিক অভিযান কর্মসূচিতে ১৯৭৮-এর ৭ সেপ্টেম্বর জোগিতাল তালুকের ১৫২টি গ্রামের মধ্যে ১৫০টি গ্রামের ৩৫ হাজার কৃষক ও মজুর মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের দাপটে শঙ্কিত কয়েক-জন জমিদার শহরে পালায়। কিন্তু অন্য অনেক জমিদার ও পুলিশ মিলে প্রতি-আক্রমণ শুরু করে। কৃষকদের ঘরবাড়ি লুঠ ও তছনছ করা, আক্রমণ এবং এমনকি গুলি চালানো প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কৃষকরাও পাল্টা জবাব দিতে শুরু করে। বিশাল পুলিশ-বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হয় এবং তাণ্ডব শুরু করে। এই কৃষক উত্থান ১৯৭৮-এর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু প্রতিহিংসামূলক পুলিশি নৃশংসতা ডিসেম্বর

পর্যন্ত চলেছিল। অভ্যুত্থান পিছু হটলেও প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাছাকাছি অনেক তালুকে তা গণচরিত্র পরিগ্রহ করে।

১৯৭৯-এর গোড়ার দিকে কৃষকরা শ্বেত-সন্ত্রাসের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আবার তাদের সক্রিয়তা ফিরে পায়। রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং তা চূর্ণ করা সম্বন্ধে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেল। গোপন কাজের প্রয়োজনীয়তা তারা অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারল এবং গোপন পদ্ধতির মানও অনেক উন্নত হলো। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সময়ে করিমনগর জেলার পেদাপল্লী, মান্থানী, হুজুরাবাদ তালুকে এবং লক্ষ্মীপেট, আশিফাবাদেও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম প্রসারিত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আরএসইউ)

১৯৭৪-এর অক্টোবরে আরএসইউ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংশোধনবাদী ধারার বিরোধিতা করে এবং মাও জে দং-এর চিন্তাধারার ভিত্তিতে বৈপ্লবিক ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এক ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। শত শত ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করে। ফলশ্রুতিতে কার্যত এক জরুরি অবস্থা জারি হয় এবং প্রশাসনিক দমন-পীড়ন নেমে আসে। পাঁচ শতাধিক ছাত্র অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয় এবং সত্তর জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সক্রিয় ছাত্র কর্মী নাগারাজু এবং চার তরুণ ছাত্র জনার্দন, মুরলী মোহন, আনন্দ রাও ও সুধাকরকে গ্রেপ্তার করে গুলি করে পুলিশ হত্যা করে। তা সত্ত্বেও আরএসইউ গোপনে সংগঠিত হতে থাকে এবং বিশেষত ওয়ারাঙ্গেলের আর ই কলেজ ও হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি— তাদের এই দুই শক্ত ঘাঁটিতে আন্দোলন চালিয়ে যায়। 'র্যাডিকাল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। পরের বছর দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনের পর নতুন আন্দোলন শুরু হয় এবং অনুপ্রাণিত কৃষক-ছাত্ররা গ্রামে ফিরে যায় কৃষকদের সংগঠিত করতে।

আরএসইউ ও আরওয়াইএল-এর (র্যাডিকাল ইউথ লীগ) প্রথম যৌথ-প্রচার অভিযান অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের এপ্রিল-জুন মাসে। এই সময়ে কৃষি বিপ্লবের রাজনীতিই শুধু প্রচারিত হয়নি, কাম্পুচিয়ার উপর সোভিয়েত মদতে ভিয়েতনামি আক্রমণের বিরুদ্ধেও ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করা হয়। ছাত্ররা সাহসের সঙ্গে পুলিশি আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল। ১৯৮০-তে অধঃপতিত সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্থান আক্রমণের বিরুদ্ধেও প্রচার চলে।

১৯৮১-তে তারা পিডব্লিউজি নেতা কুন্দাপল্লী সীতারামাইয়া-সহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে এক বৃহৎ আন্দোলনে সংগঠিত করে। ভূয়া সংঘর্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১৪ আগস্ট দমনপীড়ন-বিরোধী দিবস পালিত হয় এবং 'ভূয়া' হত্যার বিরুদ্ধে মিছিল করা হয়। রাষ্ট্রীয় দমননীতির প্রতিরোধে ১৯৮৫-৮৬ সালে আরএসইউ নতুন রণনীতি গ্রহণ করে যে, প্রকাশ্য রাজনীতির সাথে সাথে গোপন পদ্ধতিও অবলম্বন করা হবে, কিন্তু বিপ্লবী রাজনীতি খোলাখুলি প্রচার করা হবে। এই ১৯৮২ সালেই কম নাগেশ্বর রাও ভুয়া সংঘর্ষে শহিদ হন। ১৯৮৭ সালে সপ্তম রাজ্য সম্মেলনে বালিয়াপাল ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র-সহ কংগ্রেস সরকারের আধিপত্যবাদী নীতির নিন্দা করা হয়। নাগেশ্বর রাওকে স্মরণ করা হয়। দমনপীড়নের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সংগ্রামের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। সংরক্ষণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে এপিআরএসইউ-এর ভূমিকা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। মানুষকে তাদের মূল সংগ্রাম থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে রাজীব গান্ধীর উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮৭-এর মার্চে চিন্তাপল্লী অঞ্চলে ৫০টি গিরিজন গ্রামে যে বর্বরোচিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেও ব্যাপক প্রচারাভিযান চলে। ১৯৮৮ এবং '৮৯ সালে ছাত্রদের নিজস্ব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন জারি থাকে। কৃষকদের ঋণ মকুব এবং সংবিধানের ৫৯তম সংশোধনের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। নাগার্জুনসাগর পারমাণবিক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠনের সাথে এক যৌথ আন্দোলনও ছাত্ররা সংগঠিত করে।

এপিআরএসইউ-এর প্রধান নেতৃত্বের অধিকাংশ নিহত হলেও এবং কার্যত সংগঠনটি নিষিদ্ধ পরিগণিত করা হলেও, '৯০-দশকের শেষ পর্যন্ত জেলা সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হতে পেরেছিল। ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সালে দুটি রাজ্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত করা গিয়েছিল। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি প্রচার করে জনসাধারণকে 'রাইতু কুলি সংঘম'-এ যোগদান করার আহ্বান জানানো হতো।

এই সময়কালে সিপিআই-পিপলস ওয়ার-এর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে গণসংগ্রামকে যুক্ত করে স্বল্প সময়ের মধ্যে পার্টি দ্রুত গণভিত্তি সংহত করতে এবং জনগণের বৃহৎ অংশকে সমাবিষ্ট করার প্রচেষ্টা নিল। গ্রামীণ প্রতিরক্ষা বাহিনী ও গ্রামীণ জঙ্গীদের রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে পার্টি মনোযোগ দেয়। জমিদারদের পাট্টা জমি দখলের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটে। অন্ধ্র ও দণ্ডকারণ্যে হাজার হাজার একর জমি দখল নেওয়া হয়। কৃষি ঋণ মকুব, কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম, সেচের জলের সেস হ্রাস ইত্যাদি কৃষকশ্রেণীর দাবিতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সমাবিষ্ট করা হয়। দেশি মদের ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মদ বিক্রি সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার দাবিতে রূপান্তরিত হলো। সিঙ্গারেনি কয়লাখনির মজদুরদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে বিবিধ

দাবিতে তারা ধর্মঘট শুরু হয়। আশি হাজার শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ নেয় এবং ৪২ দিন ধর্মঘট চালিয়ে মূল দাবিগুলি আদায় করে নেন।

মিছিল, সভা, সম্মেলনে সাধারণ মানুষের সমাবেশ তুঙ্গে পৌঁছেছিল। পিডব্লিউজি সন্ত্রাসবাদী দল, তাদের কোন গণভিত্তি নেই— এই প্রচার মূলত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। চরম দমনপীড়নের প্রেক্ষিতে গণভিত্তি ও গণলাইন ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। চেন্না রেড্ডি সরকার কর্তৃক দমনপীড়ন কিছুটা শিথিল করার সময় মিছিলে-সভায় মানুষের সমাবেশ ছিল নজিরবিহীন। ১৯৯০-এর জানুয়ারিতে হায়দ্রাবাদে আরডব্লিউএ-র (রেভলিউশনারি রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন) প্রথম সভায় একলাখ লোকের জমায়েত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল হায়দ্রাবাদে জেএনএম-এর (জননাট্য মণ্ডলী) অষ্টাদশ বার্ষিকীতে দুই লাখ, ইন্দ্রাভেলি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, বেলামপল্লী এবং মান্দামারি সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিল। ওয়ারাঙ্গলে রায়তু কুলি সঙ্ঘমের তৃতীয় সম্মেলনে সমাবেশ (১০ লক্ষ) ছিল অন্ধ্র প্রদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ৭০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে আর জনসভায় ১০ লক্ষ জনসমাগম হয়েছিল।

খ) দণ্ডকারণ্য: পিডব্লিউজি

দণ্ডকারণ্যে লড়াইটা ছিল বন, রাজস্ব এবং আবগারি বিভাগের স্বেচ্ছাচারী সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। তারা আদিবাসীদের নির্মমভাবে লুণ্ঠন করতো। এ ছাড়া কাগজ-কলের কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদাররা অরণ্যসম্পদ কাজে লাগাতে গিয়ে শোষণ ও নিপীড়ন করতো। তাদের সবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তেন্দুপাতা সংগ্রহের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বৃহৎ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিল। তুলোর সংগ্রহ-মূল্য বৃদ্ধির দাবিতেও কৃষকদের সমবেত করা গিয়েছিল। প্রথম থেকেই জমির লড়াই ছিল অন্যতম প্রধান বিষয়। প্রথম বছরেই আদিবাসী কৃষকরা বনদপ্তরকে নানাবিধ কর দিতে অস্বীকার করে বনভূমি দখল করে চাষ করতে শুরু করে। এক বছরের মধ্যেই দু'লাখ একর জমি দখল করা হয়েছিল। ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনেরা যে বিশাল জমি জবরদখল করে রেখেছিল, সেসব ফিরিয়ে নেওয়া হলো। সমতলে ধনী ও মধ্য কৃষকদের জমি আধাআধি বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয় মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে। দুর্ভিক্ষ-বিরোধী সংগ্রাম দুই পথে হয়েছিল। দান মারফৎ শস্য সংগ্রহ করা হয় এবং শস্যগোলা নির্মিত হয়। ফসল কাটার পর কৃষকরা কিছু পরিমাণ শস্য এই গোলায় জমা রাখত, আবার দরকার পড়লে এখান থেকে শস্য নিতেও পারত। দ্বিতীয়ত, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, যারা শস্য মজুত করেছিল, তাদের শস্যভাণ্ডারে দুর্ভিক্ষ-হানা (famine raid) করা হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষ-হানায় অংশগ্রহণ করেছিল। এইসব সংগ্রাম ছাড়াও রাস্তা নির্মাণ ও জঙ্গল কাটার বিরুদ্ধে এবং বাইলাডিলাতে (মধ্যপ্রদেশ) বক্সাইট খনির জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তাদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে অন্য আর একটি সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল।

দণ্ডকারণ্যে দুটি বড়ো গণ-সংগঠন গড়ে উঠেছিল) : দণ্ডকারণ্য আদিবাসী মজদুর কিষান সঙ্ঘ (ডিএকেএমএস) এবং ক্রান্তিকারী আদিবাসী মহিলা সংগঠন (কেএমএস)। সঙ্ঘম-গুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে আদিবাসী সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। সঙ্ঘমগুলিই সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তি করতে শুরু করে, তা সে গ্রাম্য বিবাদ, পারিবারিক, বিবাহ সম্পর্কিত, জাতিগত, আদিবাসী সংস্কৃতি বা কৌম সমস্যা— যে কোন বিবাদই হোক না কেন। মানুষ-বলি, ডাকিনীবিদ্যা, অন্যান্য কুসংস্কার যা অস্বাস্থ্য ও অসুখ-বিসুখের উৎস এবং মেয়েদের শরীর অর্ধাবৃত রাখার মতো পশ্চাৎপদ আদিবাসী প্রথা ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল।

দণ্ডকারণ্য ও নর্থ তেলেঙ্গানাতে (এনটি) কৃষক অভ্যুত্থান জমিদারদের কর্তৃত্ব চুরমার করে দিয়েছিল এবং কৃষক কমিটির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান মাধ্যম ছিল বিপ্লবী কৃষক কমিটি বা গ্রাম রাজ্য কমিটি (জিআরসি)। অপর যে সংগঠন প্রথমে শত্রুকে বিব্রত এবং পরে কৃষক কমিটিকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, সেটা হলো গ্রাম রক্ষক দল (জিআরডি)।

গ) বিহার: সিপিআই (এম-এল)-পার্টি ইউনিটি

১৯৭৭-এ বিহারের জেহানাবাদ জেলের যে নকশাল বন্দীরা চারু মজুমদারের গণ-আন্দোলন বর্জনের ত্রুটি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে সত্যনারায়ণ সিং-এর পথেরও বিরোধী ছিলেন, তাঁরাই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এই দল গঠন করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে পার্টি ইউনিটি গণ-আন্দোলন শুরু করে এবং দুই দশক ধরে সশস্ত্র সংগ্রামকে গণ-আন্দোলনের সাথে মিলিত করে পরিচালনা করেছিল। জেহানাবাদ-পালামৌ অঞ্চল বিহারের অন্যতম পশ্চাৎপদ এলাকা। জীবনধারণের জন্য কৃষকদের কৃষির সঙ্গে অরণ্য সম্পদ সংগ্রহের উপরও নির্ভর করতে হয়। এই সব অঞ্চলে জমিদারদের হুকুমত ছিল অলঙ্ঘনীয়। পার্টি প্রতিষ্ঠার পর অবস্থা বদলাতে শুরু করে।

পূর্বের বামপন্থী বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সশস্ত্র বাহিনীর কার্যকলাপের জন্য গণভিত্তি গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। ভারত নওজোয়ান সভা, ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং কৃষকদের মজদুর কিষাণ সংগ্রাম সমিতি (এমকেএসএস) গঠিত হলো। পিডব্লুজি ও এমসিসি-র তুলনায় গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলনের প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, এদের জনগণের মধ্যে প্রকাশ্য সক্রিয়তা ছিল অনেক বেশি। ১৯৮৪ সালের মে মাসে

এমকেএসএস-এর পালামৌ-ঔরঙ্গাবাদ আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জমিদারদের উপর নতুন করে আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু জুন মাসে এমকেএসএস-এর জনপ্রিয় সম্পাদক কৃষ্ণা সিং-কে ঝামাতে এক সভায় জমিদাররা গুলি করে হত্যা করার ফলে আন্দোলন দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জমিদার আর গুণ্ডাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সভায় আক্রমণ চালায়। কৃষ্ণা সিং তাঁর কমরেডদের সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হলেও নিজে শত্রুর বুলেটে মৃত্যুবরণ করেন। সর্বব্যাপী নিন্দা প্রতিবাদের মুখে ৩৫ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পার্টি গেরিলা অঞ্চল বিস্তারের লক্ষ্য তুলে ধরে। ১৯৮৬ সালে বিহার সরকার পার্টি ইউনিটি পরিচালিত মজদুর কিষাণ সংগ্রাম সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, বিশেষত মধ্য বিহারের জেহানাবাদ, পালামৌ জেলায়। ১৯৮৬ সালে জেহানাবাদ জেলার আরওয়ালে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং তাৎক্ষনিক কিছু দাবিতে কৃষক সংগঠনগুলি বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন চালিয়ে যায়। মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনও শুরু হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পর কৃষকরা ন্যূনতম মজুরি প্রদানের আন্দোলনে জয়লাভ করে। ১৯৯২ সালে শুরু হলো জমি-আন্দোলন। ফসল দখল কর্মসূচি নেওয়া হলো এবং প্রতিক্রিয়াশীল পরিবারগুলির ক্ষেতে ও বাড়িতে কাজ না করার জন্য কৃষকদের সংঘবদ্ধ করা হয়েছিল। বেশ কড়াভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল। জমিদাররা তাদের লাঙ্গল-বলদ নামাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনতা তা করতে দেয়নি। গ্রামবাসীরা তাদের লাঙ্গল-বলদ বাজেয়াপ্ত করেছিল। ১৯৯৩ সালে কৃষক সংগঠনগুলি পালামৌ-গারোয়া অঞ্চলে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কুখ্যাত জমিদার বুধিনারায়ন সা'র ১৭০০ একর জমি ছিল। অবাধ্য কৃষকদের সে হাত-পা বেঁধে লাল পিঁপড়ের ঢিবিতে ফেলে দিয়ে আসত। কৃষকরা তার প্রাসাদোপম বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। চার বছর ধরে ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ লড়াই করে আসছিল। শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয়। ৭০০০ একর জমি দখল করা হয়। কুখ্যাত জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে পালায়। এই সব কাজে লাল প্রতিরক্ষা বাহিনীর অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। এমকেএসএস নিষিদ্ধ ছিল বলেই ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য।

জেহানাবাদ, গয়া, পাটনা, রোহতাস, খাগারিয়া, বেগুসুরাই, বক্সার, ভাবুয়া এবং ঔরঙ্গাবাদ জেলায় সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জন-আদালত স্থাপিত হয়েছিল। একজন একাধিক ধর্ষণকারী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পালামৌতে ৪০০ মহিলা জন-পঞ্চায়েত গঠন করেছিল। তাকে জনসমক্ষে প্রহার এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯১ সালে মজদুর কিষাণ মুক্তি মঞ্চের নেতৃত্বে (এমকেএসএস-এর পরিবর্তিত রূপ) জেহানাবাদের পারাসোনায় একজনের একক মালিকানাধীন ২২ একর জমি দখল করা হয়। ফসল কাটার সময়ে জমিদারের গুন্ডারা গ্রাম আক্রমণ করে, গুলি চালায় এবং ফসল তুলে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা দুই বছর ঐ জমি বয়কট করে এবং শেষ পর্যন্ত মালিককে জমি বিক্রি করে দিতে হয়।

পাটনার কাছে জলপুরা গ্রামে শোন নদীর বুকে ১০০০ একর চর মজদুর কিষাণ মুক্তি মঞ্চ দখল করে। মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন ছাড়া এমকেএমএম কৃষির উন্নতির দিকেও নজর দেয়। আরওয়াল ব্লকের তেনার গ্রামে ৯ কিমি বাঁধ নির্মাণের জন্য তারা কমিটি গঠন করেছিল। আশপাশের গ্রামের সাহায্য নিয়ে যৌথ শ্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যুব সংগ্রাম

১৯৯২-এর ৬ জানুয়ারি করসেবকরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর ভারত নওজোয়ান সভা (বিএনএস) রাজ্য জুড়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ব্যাপক প্রচার চালায়। ডালটনগঞ্জে যুব শাখা সাইকেল মিছিল করে। বজরং দলের গুণ্ডাবাহিনীর তাণ্ডব যুব বাহিনী দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করে, জেহানাবাদে এমকেএমএম ১৫টি ব্লকে ১২৫ কিমি সাইকেল মিছিল করে। গয়া ও বোকারোয়ে বিএনএস সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিএনএস একই ধরনের কর্মসূচি নেয়। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিগুলি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

১৯৯৯ সালে জেহানাবাদ জেলায় নারী মুক্তি সংঘর্ষ সমিতি (এনএমএসএস) ও বিএনএস দুর্নীতি এবং অনাচারের বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করে। এটা বেশি করে উল্লেখের দাবি রাখে এই কারণে যে, নব্বই-এর দশকে ঐ জেলায় গণতান্ত্রিক সভা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বেগুসরাইতেও কুখ্যাত জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়। বেগুসরাইতে এমকেএসপি কাজ শুরু করার পর, জমিদাররা কৃষকদের থেকে হাতিয়ে নেওয়া জমিগুলি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা পুলিশকে হাত করার চেষ্টা করে এবং ভাড়া করা লোচ্চা-বদমাশদের কাজে লাগায়। এমকেএসপি আহূত জনসভায় কৃষকরা সমবেত হয়। গণ-সংগঠনগুলি যে সময়ে কার্যত নিষিদ্ধ ছিল এবং গোপনে কাজ করতে বাধ্য হতো, সেই সময়তেই এই সংগ্রামগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল।

ঘ) বিহার: সিপিআই (এম-এল)-মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্র

আশির দশকের মাঝামাঝি এমসিসি সশস্ত্র কার্যকলাপের পাশাপাশি গণফ্রন্ট গঠনের বিষয়ে মন দেয়। প্রকাশ্য গণ-কার্যক্রমের জন্য তারা বিপ্লবী ছাত্র লীগ (আরএসএল) এবং দুই শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সংগঠন ক্রান্তিকারী বুদ্ধিজীবী সংঘ ও ক্রান্তিকারী সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন করে। ক্রান্তিকারী কিষান কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটির বিভিন্ন শাখা শ্রেণীশত্রুদের

বিরুদ্ধে জন-আদালত গঠন এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করতো। নারী মুক্তি সংঘ নামে মহিলা সংগঠনের কাজেও এমসিসি-র অবদান উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী মহিলাদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে এই সংগঠন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। আরএসএল-ই বিহারে প্রথম 'গ্রামে চলো' ডাক দেয়। চীন বিপ্লবের ৪০তম বর্ষে তারা তাদের প্রচারে চীন-বিপ্লবকে স্মরণ করে। ঔরঙ্গাবাদের দালেচক বাঘেরা অভ্যুত্থানে জড়িত এমসিসি সদস্যদের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সালে তারা গ্রামে গ্রামে প্রচার করে। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিরুদ্ধেও সাইকেল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গ্রামে- গ্রামান্তরে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সংগ্রামের বিস্তার সাধন করা হয়েছিল। প্রাথমিক স্তরে ক্রান্তিকারী কিষাণ সংঘর্ষ কমিটি গঠন করা হয়। এটা ছিল বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের প্রস্তুতি কমিটি। এই সংগঠনের ব্যানারেই বৃহৎ সংখ্যায় কৃষকদের সংগঠিত করা হয়েছিল। পরে এই কমিটি থেকেই ক্রান্তিকারী কিষান কমিটি-র (কেকেসি) উদ্ভব। মহিলাদের ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কুখ্যাত ডাকাতদের শাস্তি দেওয়া হয়। গীর-মাজুরিয়া জমিতে জমিদাররা গায়ের জোরে যে ফসল রোপণ করেছিল, তা কাটার সময়ে বাধা দেওয়া হয় এবং বিপ্লবী কমিটি সে ফসল বাজেয়াপ্ত করে। সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ গ্রামস্তরেই নিষ্পত্তি হতো। সশস্ত্র লাল প্রতিরক্ষা বাহিনী এই সংগ্রামে সক্রিয় মদত দিত। গ্রামের যুবকদের নিয়ে আত্মরক্ষা বাহিনী গঠিত হয়েছিল। হাজারিবাগ, গয়া এবং ঔরঙ্গাবাদ ছিল মূলত এই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি।

২। সিপিআই (মাওবাদী)-র গণলাইনের বিশ্লেষণ

পিডব্লিউজি, এমসিসি এবং পার্টি ইউনিটি দলগুলির আত্মসমালোচনা, তাদের বৈপ্লবিক কৃষি আন্দোলন ও গণ-রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। বিশেষত গোপন আন্দোলন গড়ে তোলা এবং পাশাপাশি প্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনগুলিকে পার্টিগত প্রচার ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও জে দং চিন্তাধারা প্রসারের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহারের এক তীব্র প্রবণতা বর্তমান ছিল। গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপক গণভিত্তি গড়ে তোলা যায়নি। ছাত্র ও যুব আন্দোলনে ছাত্র আন্দোলনের মঞ্চ থেকে প্রায়শ পার্টি রাজনীতি প্রচারিত হতো। অন্ধ্রপ্রদেশ র‍্যাডিকাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এপিআরএসইউ) সরাসরি কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং অনেক ছাত্রই সশস্ত্র আন্দোলন ও বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। 'গ্রামে চলো' আন্দোলনের প্রচেষ্টা ও তাঁদের আত্মত্যাগ প্রশংসনীয়, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনকে সরাসরি কৃষি অথবা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত করাটা ভুল হয়েছিল। কৃষি বিপ্লবের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ার মতো যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা তখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

ছাত্র আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য একই সময়ে, ১৯৭৮ সালে অন্ধ্র প্রদেশে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন গঠিত হয় এবং ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন স্বাধীন পরিচিতি লাভ করে। প্রথম দিকে সঠিক অবস্থানে থাকলেও, পরবর্তীকালে তারা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। গণ-সংগঠনগুলির বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে সত্তরের দশকে নবোদয় যুব সংঘ একই ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৮৯-এর শেষে কাপ্পু-কাম্মু দাঙ্গার বিরোধিতায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটা ঘটনা যে, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটি ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সশস্ত্র আন্দোলন স্থগিত রেখেছিল, কিন্তু বিদ্যমান 'বাম'ঝোঁকগুলি বজায় ছিল। র‍্যাডিকাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও র‍্যাডিকাল ইউথ লীগ সরাসরি গেরিলা ক্রিয়াকাণ্ড না চালালেও, সরাসরি পার্টিগত প্রচার এবং সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিপ্লবী লেখক সমিতি, অল ইণ্ডিয়া লীগ ফর রেভলিউশনারি কালচার ইত্যাদি সংগঠনেও একই ঝোঁক দেখা যায়। তাদের ম্যানিফেস্টোতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও জে দং চিন্তাধারা-র প্রচার ছিল অবশ্যকর্তব্য। একইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ সিভিল লিবার্টিজ কমিটি মানবাধিকার আন্দোলনকে পিডব্লিউজি রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার ফলে কার্যত প্রথমে পিডব্লিউজি এবং পরে সিপিআই (মাওবাদী)-র ফ্রন্ট-সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। যদিও এপিসিএলসি-র ভূমিকা প্রশংসনীয়। এই ঝোঁকের ফলে সত্তরের দশকে অন্ধ্রে মানবাধিকার আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখনও অন্ধ্রপ্রদেশে মানবাধিকার আন্দোলনে এই ঝোঁক বজায় আছে। মহারাষ্ট্রেও একই অবস্থা। বিদ্যার্থী প্রগতি সংঘ সর্ববৃহৎ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুললেও, গণ-সংগঠনকে সঠিক পরিচিতি দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই সব সমাবেশ থেকে পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারিত হতো। আশির দশকে, বিদ্যার্থী যুব জাগৃতি সংগঠন নামে এক ছোট কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংগঠন পার্টিগত মতাদর্শের আধিপত্যকে অস্বীকার এবং ছাত্র সংগঠনগুলির এক স্বকীয় গণতান্ত্রিক পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, এবং ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা ও ভর্তি হওয়ার সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এরাও দক্ষিণপন্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বিহারের কৃষক সংগঠনগুলিকে সক্রিয় করে তোলা ও বিপ্লবী কৃষি আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করার ক্ষেত্রে (বিশেষত পার্টি ইউনিটির পরিচালনায়) কর্মী ও নেতৃত্বের দক্ষতা ও ধৈর্যের প্রশংসা করতেই হয়। কিন্তু শেষের দিকে সশস্ত্র বাহিনীর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দমনপীড়নও বৃদ্ধি

পেয়েছিল। ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও বিএনএস অথবা আরো আগে রেভলিউশনারি স্টুডেন্টস লিগ সেরকম ভাবে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কৃষক সংগঠন-গুলিকে প্রায়শ কৃষক প্রতিরোধ লড়াইয়ের পরিপূরক হিসাবে, সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটি এলাকা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। বাস্তবত, কৃষক গণ-আন্দোলনে সশস্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র ক্রিয়াকাণ্ড, বিপ্লবী কৃষি আন্দোলনে ও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে কিছুটা বিপত্তি সৃষ্টি করেছিল এবং গণ-প্রতিরোধকে প্রতিস্থাপিত করেছিল। সত্যি বলতে কি, লাল প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা সর্বত্র প্রশ্নাতীত ছিল না। যেমন, ১৯৮৭-তে দালচক-বাঘুরাতে প্রতিশোধমূলক কাজ বা বিশেষত জেহানাবাদ-পালামৌ অঞ্চলে এমকেএসএস-এর (পরবর্তী কালে এমকেএমএম) প্রতিরোধ সংগ্রাম। পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি-র (পিএলজিএ) কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র, যুব ও কৃষক সংগঠনগুলি, এমনকি গুপ্ত থেকেও, গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে অসমর্থ হয়েছিল। দণ্ডকারণ্যে গভীরভাবে এই ত্রুটিগুলি অনেকটা সংশোধন করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও গণ-সংগঠনগুলি কেবলমাত্র পিএলজিএ-র ঘাঁটি এলাকা নির্মাণের কাজেই বেশি করে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক রূপের যে ভ্রূণ বিকশিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষক ও শ্রমিক ইউনিয়ন (ডিএকেএমএস), মহিলা সমিতি (কেএমএমএস) এবং গ্রাম রাজ্য কমিটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাদের কেউই বড়ো আকারে গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলতে কিংবা জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে সক্ষম নয়। এটা লক্ষ্যণীয় যে, পূর্বতন পিডব্লুজি, পার্টি ইউনিটি অথবা এমসিসি দলের যে সব এলাকায় কর্মবিস্তার ঘটেছিল, সেই সব এলাকায় বিগত এক দশকে গণ-আন্দোলনে এবং সিপিআই (মাওবাদী)-র সংগঠন বিস্তারে ভাঁটা এসেছে।

বাস্তবে সিপিআই (মাওবাদী) এই মুহূর্তে ভারতে সবথেকে সক্রিয় বিপ্লবী শক্তি, পৃথিবীতে সব থেকে বড়ো সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন তারাই পরিচালনা করছে। বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও সংস্কৃতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক অবস্থা রাশিয়া বা চীনের থেকে অনেক বেশি জটিল। যাই হোক, এটাও ঘটনা যে, দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার মতো বিষয়গত পরিস্থিতি ভারতে বিরাজ করছে না। কৃষক-জনগণের সশস্ত্র বিপ্লবী প্রতিরোধ গড়ে ওঠার আগেই তারা তাদের গেরিলা অঞ্চলে চলমান যুদ্ধ শুরু করেছে। একটা সঠিক সামরিক লাইন গড়ে তোলা যায়নি যাতে সশস্ত্র বাহিনী সঠিকভাবে জনগণের আন্দোলনে সাহায্য করতে পারে। অন্ধ্রে দুই দশকব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের ২০০০ সালে বিপর্যয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ভোলা উচিত নয়। ভারতবর্ষে আন্দোলন এখনও জনগণের বিপ্লবী প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতির স্তরে রয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি, সিপিআই(মাওবাদী) তাদের ১৯৮০ সালে ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী চলতে সক্ষম হয়নি এবং চারু মজুমদার যুগের ত্রুটি মূলত সংশোধন করতে পারেনি।

আর পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিয়ে সিপিআই (মাওবাদী) গুরুতর ভুল করেছিল। গণ-আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপূরক হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু পিসিএপিএ-কে যথাযথ স্বাধীনতা অথবা আদিবাসীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিকাশের যথেষ্ট পরিসর দেওয়া হয়নি। কার্যত পিসিএপিএ মাওবাদী সশস্ত্র বাহিনীর ফ্রন্ট সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। উড়িষ্যাতে, যদিও চাষীয়া-মুলিয়া আদিবাসী সংঘ মাওবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু সংঘের নেতৃত্ব ও কর্মীদের মতপার্থক্য আছে। সঠিক গণ-সংগঠনের ধাঁচা তৈরি করা হয়নি। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সিপিআই(মাওবাদী) দণ্ডকারণ্যে গেরিলা অঞ্চলে অসমসাহসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিরোধ করেছে। দণ্ডকারণ্যে পূর্বেকার অনেক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। নকশালবাড়ির পর এটাই সশস্ত্র প্রতিরোধের সর্বোচ্চ রূপ। তবুও মুক্তাঞ্চল গঠনের প্রশ্নে তেলেঙ্গানার স্তর তারা অতিক্রম করতে পারেনি।

নকশালপন্থী আন্দোলনের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব ও প্রয়োগের সব থেকে সঠিক গণলাইন বিকশিত হয়েছিল নকশালবাড়ির লড়াইয়ের প্রাথমিক পর্বে এবং শ্রীকাকুলামে আন্দোলনের সময়ে— টি নাগি রেড্ডি এবং ডি ভেঙ্কটেশ্বর রাও অন্ধ্র প্রদেশ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এপিসিসিসিআর) পর্যায়ে যার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের মধ্যে পূর্ব গোদাবরী জেলায় কোন্দামোদালু এলাকায় এক ছোট্ট অঞ্চলে এপিসিসিসিআর-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী কৃষি সংগ্রাম বিকশিত হয়। গিরিজন গোষ্ঠীর এক বড়ো অংশ 'শ্রেণী শত্রু খতম' পথ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিল। ১৯৯৪ সালে পাঞ্জাবেও কমিউনিস্ট পার্টি রি-অরগানাইজেশন সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (এমএল)-এর নেতৃত্বেও এই সঠিক পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। টি এন রেড্ডি ও ডি ভি রাও-এর অবদানকে সিপিআই (মাওবাদী) স্বীকৃতি দেয়না। পূর্বতন পিপলস ওয়ার গ্রুপ এবং এপিসিসিসিআর-কে তারা সংশোধনবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। অবশ্য পাঞ্জাবের সিপিসিআরআই (এম-এল) এখন সিপিআই (মাওবাদী)-দের চোখে সাচ্চা বিপ্লবী শক্তি।

চারু মজুমদারের 'বাম' রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে টি এন রেড্ডি এবং ডি ভি রাও-এর নেতৃত্বে এপি সিসিসিআর রুখে দাঁড়িয়েছিল। পরে তাঁরা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির (এআইসিসিসিআর) নেতৃত্বেও অংশ নিয়েছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে, কমরেড টি এন চারু মজুমদারের নেতৃত্বে এআইসিসিসিআর-এর 'বাম' রোমান্টিকতার সমালোচনা

করে, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আজও প্রণিধানযোগ্য: ১) জমিদারদের অনুগত গুন্ডাবাহিনী ও সরকারি দমনপীড়নের প্রতিরোধেই একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংগ্রামের চরিত্রও হবে গণ-প্রতিরোধ। সিপিআই(এম-এল) এই তত্ত্ব বাতিল করে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলীয় (squad) তৎপরতার পথ গ্রহণ করে; ২) জনযুদ্ধ প্রতিরোধের আকারেই শুরু হয়, আক্রমণের পথে নয়। এভাবে না হয়ে প্রত্যেক জমিদারকে আক্রমণ করার রাস্তায় গেলে তা বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে চলে যায়; ৩) জনগণের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামকে গেরিলা যুদ্ধ বলা যায়না, এমন কী সশস্ত্র পথ যখন দেশে সংগ্রামের প্রধান রূপ, তখনও নয়। অসম বিকাশের জন্য, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেখানে বিপ্লবী সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়নি, সেখানে সংগ্রামের অন্যান্য রূপ গ্রহণ করা উচিত এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে সেগুলির সমন্বয় সাধন করা কর্তব্য। শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণ যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে, তা আক্রমণাত্মক। তথাপি শাসক শ্রেণীর সশস্ত্র বাহিনীর তুলনায়, সংখ্যা এবং দক্ষতার বিচারে জনগণের গেরিলা বাহিনী অনেকটাই পিছিয়ে আছে এবং দীর্ঘসময় তাই থাকবে। এই সময়কালে গেরিলা অঞ্চলকে রক্ষা এবং বিপ্লবীদের আত্মরক্ষার ডাক দিয়েই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জনগণের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ও দক্ষতা একটা নির্দিষ্ট মান অর্জন করার পরই কেবল সশস্ত্র সংগ্রাম উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়। তখন সশস্ত্র সংগ্রাম চলমান যুদ্ধের রূপ নেবার এবং পরবর্তী কালে অবস্থান যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

১৯৯৫ সালে সিপিসিআরসিআই(এম-এল) এই পথ সমর্থন করে। তাদের মতে, যদিও সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী গেরিলাযুদ্ধ চরিত্রের বিচারে প্রথমাবধি জনগণের, বিশেষত কৃষক জনতার ব্যাপক সমর্থন ও অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল, তবুও একটি মুক্তাঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জনসমর্থনের সর্বাঙ্গীন বহিঃপ্রকাশ। এর অর্থ শত্রুর শক্তিকে পরাস্ত করার মতো জনগণের নিজস্ব এক যথেষ্ট উন্নত এবং শিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী থাকবে। জনগণের এক বিশাল অংশ জনগণতান্ত্রিক কর্মসূচি, বিশেষত কৃষি বিপ্লবে উজ্জীবিত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য নিজস্ব সংগঠন গরে তুলবে এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ চালাবার মতো শক্তিশালী বাস্তব সমর্থন আদায় করতে পারবে। এই ধরনের মুক্তাঞ্চল সমস্ত দেশের বিপ্লবী জনতার নিকট বিপ্লবী বিকল্পের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত হয়ে শত্রু-কবলিত এলাকায় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে। নিজস্ব শ্রেণীগত দাবিকেন্দ্রিক সংগ্রাম ও শাসক শ্রেণীর ঘাঁটি এলাকা অবরোধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম সর্বত্র প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত হবে। সুতরাং মুক্তাঞ্চলের অর্থই হচ্ছে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সর্বাঙ্গীন যুদ্ধ। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং তৎসহ আমাদের দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সামাজিক শক্তিতে বিশাল কিন্তু সামরিক শক্তিতে দুর্বল জনগণের বাহিনী যখন সংখ্যার বিচারে দুর্বল অথচ অনেক বেশি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুর মোকাবিলা করে, গেরিলা যুদ্ধই তখন একমাত্র পথ। এই পথেই ক্ষমতার ভারসাম্যে বদল ঘটানো যেতে পারে।

ভারতবর্ষের অতীত কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, বিশেষত তেলেঙ্গানা (১৯৪৬-৫১), নকশালবাড়ি (১৯৬৭-৬৮) এবং শ্রীকাকুলামের (১৯৬৮-৭০) সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম জনগণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথের পক্ষেই স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা এবং বিভিন্ন দুর্বলতা সত্ত্বেও ঐ তিন সংগ্রাম দেখিয়েছিল, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষক সংগ্রাম যখন কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচি হিসাবে অথবা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিপ্লবী রাজনীতির আধারে পরিচালিত হয়, সেই সংগ্রাম কীভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষি-অভ্যুত্থান ও গেরিলাযুদ্ধে উন্নীত হতে পারে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষক-নির্ভর গেরিলাযুদ্ধের সাহায্যে ভারতের গ্রামাঞ্চলে জনগণের সমান্তরাল রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্মাণের বাস্তবতা সম্পর্কে সব থেকে প্রামাণ্য ও কার্যকর উদাহরণ মহান তেলেঙ্গানা সংগ্রাম। সিপিআই(মাওবাদী) নেতৃত্বে পরিচালিত গণসংগ্রাম এই শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। গঠিত হওয়া অবধি, এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশে তাদের পূর্বসূরীরাও, শত্রুর উন্নততর শক্তি সম্বন্ধে অবমূল্যায়ন করে এসেছে। ১৯৮০ সালে পিডব্লিউজি অন্ধ্রপ্রদেশে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যে ভুল করেছিল, জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জির টিএমসি প্রসঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই একই ত্রুটির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

গণসংগঠন ও গণলাইন সম্পর্কে টি নাগি রেড্ডির শিক্ষা সিপিআই (মাওবাদী)-র অবশ্যই বিচার-বিবেচনায় আনা উচিত। নাগি রেড্ডি সিপিআই (মাওবাদী)-কে প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি হিসাবে স্বীকার করতেন, কিন্তু সশস্ত্র জনযুদ্ধের উপযুক্ত বিষয়গত উপাদান বিরাজ করছে, এটা তিনি কখনোই স্বীকার করতেন না।

References :

1. ‘30 years of Naxalbari— Naxalbari is not just the name of a village’
2. *Mukti Marg*
3. *People's Resistance*
4. Historical and Polemical documents of Communist Movement of India of T.N.Memorial Trust.(1964-72)
5. *Maoist Information Bulletins*
6. Maoist Documentation project